বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 561 — May 1910

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি. এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৭ বর্ষ। ৫৬১ সংখ্যা। { বৈশাখ, ১৩১৭। মে, ১৯১০। } ৯ম কল্প। ৩য় ভাগ।

	*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
আঃ	বৃ	র	বু	র	বৃ	র
শেঃ	৩১	৩১	৩২	৩১	৩১	৩০
	শ	ম	শ	ম	শ	সো
	†A	M	J	Jy	A	S
	‡14	15	15	17	17	18
আঃ	শু	র	বু	শু	সো	বৃ
শেঃ	30	31	30	31	31	30
	শ	ম	বৃ	র	বু	শু

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩১৭ সাল।
ফসলী ১৩১৭-১৮।
হিজরী ১৩২৭-২৮।
খৃষ্টাব্দ ১৯১০-১১।
শকাব্দা ১৮৩২।
সংবৎ ১৯৬৭-৬৮।
মগী ১২৭২-৭৩।
ব্রাহ্ম সংবৎ ৮১-৮২।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
আঃ	ম	বৃ	শু	র	সো	বু
শেঃ	৩০	২৯	৩০	২৯	৩০	৩০
	বু	বৃ	শ	র	ম	বৃ
	O	N	D	J	F	M
	18	17	16	15	13	15
আঃ	শ	ম	বৃ	র	বু	বৃ
শেঃ	31	30	31	31	28	31
	সো	বু	শ	ম	ম	শু

বৃ	র	বু	র	বু	র
শু	সো	বৃ	সো	বৃ	সো
শ	ম	শু	ম	শু	ম
র	বু	শ	বু	শ	বু
সো	বৃ	র	বৃ	র	বৃ
ম	শু	সো	শু	সো	শু
বু	শ	ম	শ	ম	শ

§১	৮	১৫	২২	২৯
২	৯	১৬	২৩	৩০
৩	১০	১৭	২৪	৩১
৪	১১	১৮	২৫	৩২
৫	১২	১৯	২৬	
৬	১৩	২০	২৭	
৭	১৪	২১	২৮	

ম	বৃ	শু	র	সো	বু
বু	শু	শ	সো	ম	বৃ
বৃ	শ	র	ম	বু	শু
শু	র	সো	বু	বৃ	শ
শ	সো	ম	বৃ	শু	র
র	ম	বু	শু	শ	সো
সো	বু	বৃ	শ	র	ম

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃ এঃ,	৭	৫	৪	২,৩১	৩০	২৭
পূঃ,	১১	১০	৮	৬	৪	২
কৃঃ এঃ,	২২	২১	১৯	১৬	১৪	১২
অঃ,	২৬	২৪	২২	২০	১৮	১৬

আঃ—আরম্ভ। শেঃ—শেষ।
শুঃ এঃ-শুক্ল একাদশী, পূঃ-পূর্ণিমা।
কৃঃ এঃ-কৃষ্ণ একাদশী, অঃ-অমাবস্যা।
* ※ ৭ই বৈশাখ বুধবার ও ৫ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার শুক্ল একাদশী। ১১ই বৈশাখ রবিবার ও ১০ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার পূর্ণিমা। ২২শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার ও ২১এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার কৃষ্ণ-একাদশী, ২৬এ বৈশাখ সোমবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

*১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার আরম্ভ ও ৩১শে শনিবার শেষ। ১লা বৈশাখ ইং ১৪ই এপ্রেল।

+ A এপ্রেল আরম্ভ শুক্রবার, শেষ ৩০শে শনিবার।

‡ ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৫ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

§ ১লা বৈশাখ বৃহস্পতি, ২রা শুক্র ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ রবি, ২রা সোম ইত্যাদি।

বৈশাখ বৃহস্পতি } ১ ৮ ১৫ ২২ ২৯
জ্যৈষ্ঠ রবি }

এক এক দিকে ৬টী করিয়া দুই দিকে ১২ মাসের গণনা।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃ এঃ,	২৭	২৬	২৭	২৬	২৭	২৬
পূঃ,	১	১	১,৩০	০	১,৩০	৩০
কৃঃ এঃ,	১১	১১	১২	১২	১২	১২
অঃ,	১৫	১৫	১৬	১৬	১৭	১৬

* ※ ২৭এ কার্ত্তিক রবিবার ও ২৬শে অগ্রহায়ণ সোমবার শুক্ল একাদশী। ১লা কার্ত্তিক মঙ্গলবার ও ১লা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা। ১১ই কার্ত্তিক শুক্র কৃষ্ণ একাদশী। ১৫ই কার্ত্তিক মঙ্গল অমাবস্যা ইত্যাদি।

এইরূপ মধ্যম স্তম্ভের তারিখের সহিত বাম বা দক্ষিণ স্তম্ভের মাস, বার মিলাইয়া ধরিলে মাস, বার ও তিথি ঠিক্ হইবে।

নব বর্ষের আবাহন।

এস নব বর্ষ! নবীন ঝঙ্কারে
পাপিয়া ধরেছে নব তান,
ঢাল নব বল, ঢাল সুধাধারা
পুলকিয়া মানবের প্রাণ।

সরলা প্রকৃতি নবীন ভূষণে
সুন্দর সাজে সেজেছে মরি!
নবীন কবির হৃদয়ের বীণা
নবীন রাগে উঠে ঝঙ্কারি।

এ নব আবেশে নবীন পুলকে
জন্মভূমির কল্যাণ তরে—
মঙ্গল আরতি জলিয়া উঠুক
ভকতজনহৃদি-মন্দিরে।

আর্য্যবংশধর ভারতসন্তান
নমঃ মাতৃপদে ভক্তিভরে।
নবীন আলোকে তোমরা সকলে
নেহার আজিকে জননীরে!!

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শিল্পোন্নতি — ময়ূরভঞ্জের মহারাজ তাঁহার রাজ্যমধ্যে একটী কাগজের কল স্থাপন করিতেছেন। উক্ত রাজ্যে কাগজ-প্রস্তুতের উপাদান প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। মহারাজের শিল্পোন্নতির উদ্যম প্রশংসনীয়।

স্মৃতি—স্বর্গীয় মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্মৃতি সংরক্ষণার্থ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ একটী স্মৃতিমন্দির স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন। এই মহৎ কার্য্যে রাজা মহারাজ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ মুক্ত-হস্তে দান করিতেছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা—গত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ১,২০০, দ্বিতীয় বিভাগে ৮১৯ ও তৃতীয় বিভাগে ৮১১, সর্ব্বসমেত ২৮৩০ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বালিকাগুলি উত্তীর্ণ হইয়াছে।

প্রথম বিভাগ।

সুপ্রভা ভট্টাচার্য্য—ডাওসিসান মিশন (কলিকাতা)।
ইন্দুপ্রভা বিশ্বাস—এলেকজান্ড্রা, ময়মনসিং।
শান্তিলতা বসু—ঢাকা, ইডেন।
প্রিয়তমা চাটার্জি — ঐ।
শান্তা চট্টোপাধ্যায়—বেথুন।
সুপ্রভা দাস—ঢাকা, ইডেন।
ফারওয়েল এলিজাবেথ—প্রাইভেট।
সুশীলাবালা ঘোষ—ইউ, এফ, সি, মিশন।
মোহিতবালা মজুমদার—বেথুন কলেজ।
বিভাবতী মিত্র—এলেকজান্ড্রা, ময়মনসিং।
সুরীতি মিত্র—লোরেটো হাউস।

ক্ষীরোদমণি সেন—ইডেন, ঢাকা।
নলিনী সরকার—লোরেটো হাউস।

দ্বিতীয় বিভাগ।

সরলাবালা বাগচি—ডিয়োসিসান মিশন।
প্রিয়তমা দাস—ঢাকা, ইডেন।
শরৎবালা রক্ষিত— ঐ।
ললিতা রায়—ব্রাহ্মগার্লস।
রোচার্স এসনেস—লরেটো হাউস।

বিলাতে ভারতীয় ছাত্র—বিলাতে গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২জন বাঙ্গালী ছাত্র বি, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই পূর্ত্তবিভাগে অধ্যয়ন করিতেছেন।

মৃত্যু—কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মিউনিসিপাল কমিশনার, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কালেক্টর বাবু চন্দ্রনারায়ণ সিং বাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিলাতে অন্নাভাব—শুনা যায় গত ১৯০৮সালে ইংলণ্ডে ১২৫জন লোক অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ইহার মধ্যে ৫২জন লণ্ডন সহরেই অনাহারে মারা গিয়াছে।

পার্লামেণ্ট—২৯শে এপ্রেল হইতে ৭ই মে পর্যান্ত পার্লামেণ্টের কার্য্য বন্ধ থাকিবে। বসন্তকালে এইরূপ অবকাশ গ্রহণ বিলাতে বহুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

এ বৎসর দুইটী বালিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। ডাক্তার নীলরতন সরকারের কন্যা নলিনীবালা ও ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা মোহিত বালা মজুমদার। বিশেষ আনন্দের বিষয়।

প্রার্থনা।

হে সকল সত্যের আদি সত্য জাগ্রত দেবতা! ঐ উজ্জ্বল পবিত্র সন্নিধানে উপনীত হইতে হইলে, আমাদের মলিন পরিচ্ছদ, মিথ্যা ব্যবহার, কপটতা ও সকল প্রকার অসারতা পরিত্যাগ করিয়া না আসিলে কিরূপে সেই জ্যোতির্ম্ময় রূপ প্রত্যক্ষ করিব; এ হৃদয় পবিত্রতা-সলিলে বিধৌত না হইলে, নিষ্কাম প্রেমের ফুল প্রস্ফুটিত না হইলে, ভক্তিভাবের স্নিগ্ধ চন্দনে বিভূষিত না হইলে, হে পরমারাধ্য দেব! তোমার অর্চ্চনায় প্রাণ মন নিয়োজিত করিতে পারিব কিরূপে! এ সংসার-ক্রীড়া-কাননে কত ক্রীড়াসামগ্রী প্রদান করিয়া আমাদিগকে খেলিতে পাঠাইয়াছ। তোমার প্রদত্ত দ্রব্যলাভে মত্ত হইয়া আমরা, হে সর্ব্বসুখদাতা পিতা! তোমাকেই ভুলিতেছি। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, আমরা যে পথের যাত্রী, কত ঘাত-প্রতিঘাতে শিক্ষা লাভ করিয়া কত কণ্টকাকীর্ণ পথ, কত রাজ্য অতিক্রম করিলে তবে,

হে পরম পিতা! পরম মাতা! তোমার সেই অমৃতময় প্রেমের রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারিব, কোথায়, সে কত দূরে? পথের মধ্যে প্রবৃত্তির রাজ্যে পড়িয়া আমরা যে নিবৃত্তির পথ দেখিতে পাই না, কি হইবে প্রভু! কি উপায় হইবে, তোমার মঙ্গলময় হস্ত প্রসারণ করিয়া ধীরে ধীরে আমাদিগকে নিবৃত্তির রাজ্যে লইয়া চল, এখানে হৃদয় সর্ব্বদা শঙ্কায় ত্রাসিত, দুর্ব্যবহারের কষাঘাতে জর্জ্জরিত, সন্তাপে বিষাদিত হইয়া আছে, নিবৃত্তির রাজ্য দিয়া গমন করিলে অচিরেই অমৃতময়, প্রেমময় রাজ্যে তোমার ছায়ায় উপবেশন করিয়া কৃতার্থ হইব। ইহাই আমাদের আশীর্ব্বাদ কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড।

"ক গতাঃ পৃথিবীপালাঃ সসৈন্যবলবাহনাঃ।
বিয়োগসাক্ষিণী যেষাং ভূমিরদ্যাপি তিষ্ঠতি॥"
—কোথা গেল সে সকল মহীপালগণ?
কোথা সে বিপুল সৈন্য? সে যান-বাহন?
যথায় আছিল তারা, সে সকল স্থান—
আজিও ধ্বংসের সাক্ষ্য করিছে প্রদান।

সে রাম-যুধিষ্ঠির নল-হরিশ্চন্দ্রাদি আর এ জগতে নাই, এবং কেহই থাকিবে না, সকলকেই যাইতে হইবে। যদি জগতে ধ্রুব ও অবিসংবাদিত সত্য কিছু থাকে, তবে তাহা মৃত্যু। কিন্তু এই মৃত্যু দুই প্রকার। আধিভৌতিক মৃত্যু ও আধ্যাত্মিক মৃত্যু। যাঁহারা বিশ্বপ্রাণ বা পরার্থপ্রাণ, তাঁহাদের আধিভৌতিক মৃত্যু হইলেও, আধ্যাত্মিক মৃত্যু হয় না। তাঁহাদের ভৌতিক দেহ অদৃশ্য হইলেও, তৈজস কীর্ত্তিময় দেহ প্রলয়েও লয় পায় না। কেননা, তাহা সেই অনন্ত-অব্যয় সচ্চিদানন্দে মিলিয়া আনন্ত্য লাভ করে। যে সকল কীর্ত্তিময় মহাপুরুষ এই আনন্ত্য লাভ করিয়াছেন, আমাদের নিত্য-প্রাতঃস্মরণীয়, বিশ্বজনীন শান্তি ও সদ্ভাবের প্রবর্ত্তক, মহীয়ান্ সম্রাট্ ৭ম এডওয়ার্ড, তাঁহাদের অন্যতম। তাই আজি তাঁহার অভাব, বিশ্বের অভাব; তাঁহার অভাবশোক, বিশ্বের শোক। তাই আজি তাঁহার অভাবে ব্রহ্মাণ্ড স্ফুটিত হইয়া হাহাকার উত্থিত!

বিশ্বপ্রেমিকগণ কি মোহিনী মায়া, কি সম্মোহন মন্ত্র জানেন! তাই ৭ম এডওয়ার্ডের ইঙ্গিতমাত্র, সংগ্রামোন্মুখ, বলদর্পিত য়ুরোপীয় মহীপালগণ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া, দংশনোন্মুখ, সমুদ্যত ফণাচক্র সঙ্কুচিত করিতেন।

যেমন হাঁড়ির দুই একটী অন্ন টিপিয়া দেখিলেই সমস্ত অন্নের পাক বুঝা যায়, তেমনি প্রকৃত মহাপুরুষচরিত্রের দুই একটী কথা বলিলেই, তাঁহার সমস্ত

চরিত্রের প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম হয়। বিশেষতঃ যে মহাত্মার কথা হইতেছে, তিনি অশেষ গুণের মহাসিন্ধু। সে মহাসাগরে থাই দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। এজন্য সে অসাধ্যসাধনায় ক্ষান্ত থাকাই ভাল। জগতের সমস্ত ইতিহাস উল্টাইয়া দেখ, দেখিবে, যাঁহারা ঈশ্বরকৃপায় বড়লোক হইয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বড় মার সন্তান। এই জন্যই শাস্ত্রে বলে,—"চীয়তে বালিশস্যাপি সৎক্ষেত্রপতিতা কৃষিঃ।"—অর্থাৎ ক্ষেত্র ভাগ হইলে, ফল উৎকৃষ্ট হয়। ৭ম এডওয়ার্ড বড় মার সন্তান। সে যে কিরূপ মা! কত বড় মা! তাহা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বরে প্রকাশিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রসিদ্ধ ঘোষণা-পত্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে, জেতৃ বিজিত নির্ব্বিশেষে মহারাণীর প্রজামাত্রেই সমান। কণামাত্র ইতর-বিশেষ নাই। ইহাই উক্ত ঘোষণাপত্রের মর্ম্ম। যাঁহার হৃদয় হইতে এত বড় কথা বাহির হইয়াছে, তাঁহার মহিমার সীমা নাই। ৭ম এডওয়ার্ড সেই বড় মার বড় ছেলে। শুধুই তিনি মাতার অনস্তমিতসূর্য্য, অপরিসীম পার্থিব সাম্রাজ্যের অধিকারী নহেন, তিনি, অপরিসীম ঔদার্য্যের ও বিশ্বদ্রাবিণী প্রেমশক্তির আধারস্বরূপ, দেবদুর্লভ মাতৃ-হৃদয়েরও অধিকারী ছিলেন। তাই আজি চরাচর বিশ্ব তাঁহার শোকে হাহাকারমগ্ন। তাই আজি ইউরোপ, আমেরিকা, আসিয়া, তাই আজি আফ্রিকার অসভ্যতম, নিরক্ষর জাতিরাও, সমস্বরে ও সমপ্রাণে হাহাকার তুলিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—আমাদের অপার গুণসিন্ধু সম্রাটের গুণের পরিসীমা নাই। কত সময়, কত ঘটনায় যে, তাঁহার দেবহৃদয় হইতে সে সকল গুণের পরিচয় স্বতই নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এস্থলে অন্য একটীমাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি, ইহাতেই সকলে বুঝিবেন, তিনি কি গুণের মানুষ ছিলেন। নিজ প্রজা-বর্গের প্রতি তাঁহার অন্তরাত্মার কিরূপ প্রীতি ও কত মমতা ছিল?

বোধ হয়, সকলেরি স্মরণ আছে, তিনি নিজ রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পূর্ব্বে কিরূপ সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাগত ছিলেন। বড় বড় চিকিৎসকেরা সকলেই তাঁহার জীবনের বিষয়ে এককালে হতাশ হইয়াছিলেন। অস্ত্রচিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ক্লোরোফরম করিয়া অজ্ঞান করা হইল। তিনি যে আর চৈতন্য লাভ করিবেন, এ আশা কেহই করেন নাই। কিন্তু মঙ্গল-ময়ের কৃপায় তিনি যেই সংজ্ঞালাভ করিলেন, অমনি তাঁহার মুখ হইতে সর্ব্বাগ্রেই এই কথা বহির্গত হইল —"আমার প্রাণাধিক প্রজারা কি আমাকে ক্ষমা করিবেন?" (অর্থাৎ আমার এই পাপপীড়ার জন্যই আমার প্রজাগণের অভিষেকমহোৎসবে বাধা পড়িল। ইহাতে না জানি, তাহাদের উৎসাহভঙ্গ ও কতই মনঃকষ্ট হইয়াছে।) তাই সেই প্রজাপ্রাণ মহাপুরুষের মৃতকল্প, অচেতন দেহে ঈষৎ সংজ্ঞার সঞ্চার

হইবামাত্র, তাঁহার বদন হইতে প্রথমেই প্রজার কথা বহির্গত হইয়াছিল। আজি আমরা তাঁহাকেই হারাইলাম! হে নররূপী মহাদেব! হে প্রজাপ্রাণ! হে বিশ্ববন্ধো! হে কৃপাপীযূষসাগর! হে বিশ্বপ্রেমের আদর্শ! হে দীনহীনাতুর-নিরাশ্রয়গণের আশ্রয়! হে বিশ্বজনীন মহাশান্তির আধার! তুমি জগৎকে অনাথ করিয়া গেলে !!!

মহাত্মা ৭ম এডওয়ার্ড, মহারাণী ভিক্টোরিয়া মাতার জীবদ্দশায় যখন ভারতপরিদর্শনার্থ আসিয়াছিলেন, তখন বলিয়া যান যে, আমি প্রাণান্তে ভারতের কথা ভুলিব না। ভারতবাসীর স্বার্থ আমার সর্ব্বোপরি চিন্তনীয়। তিনি সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত হইয়া, পদে পদে সে অঙ্গীকার পালন করিয়াছিলেন। অন্ততঃ ইংলণ্ডে রাজশক্তি যতটুকু আছে, তাহা তিনি ভারতবাসীর কল্যাণকল্পে প্রয়োগ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই যে আজি ভারতীয় সুযোগ্য প্রজাবৃন্দকে লইয়া প্রাদেশিক শাসনসমিতি সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহার মূলেও সেই যজ্ঞেশ্বর, নরদেব এডওয়ার্ড। ইংলণ্ডে দরিদ্রগণের দুর্দ্দশা অতীব শোচনীয়। বিশেষতঃ দরিদ্র রোগিগণের অবস্থা লোমহর্ষণ। করুণাময় এডওয়ার্ড ঐ সকল দীনহীনের ও নিরাশ্রয় রোগিগণের কল্যাণার্থে স্বতঃ পরতঃ অশ্রান্ত চেষ্টা করিতেন। তাঁহারই সাহায্যে ও ঐকান্তিক প্রযত্নে ইংলণ্ডে বড় বড় আতুর-নিবাস ও দরিদ্র-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি রাজ্যাভিষেককালে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায়ন পাইয়া, তৎক্ষণাৎ সে সমস্ত অর্থই ঐ সকল আতুরনিবাসে ও দরিদ্রভাণ্ডারে দান করিয়াছিলেন। যিনি কোটি কোটি মানবের হৃদয়সিংহাসনে রাজ্য করেন, তিনিই স্বরাট্-সম্রাট্। প্রেমের রাজ্যের ধ্বংস নাই, বিকার নাই, বিপ্লব নাই। বিশ্বজীবনজীবন, প্রেমময় ৭ম এডওয়ার্ড এই পার্থিব রাজ্যের অভ্যন্তরে যে অপার্থিব ও অবিকারী, শাশ্বত প্রেম-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন, তাহাই অলক্ষ্যে অলক্ষ্যে দিন দিন উপচিত হইয়া, কালে নিখিল বসুন্ধরাকে ধৃতপাপ করিয়া অদ্বৈত শান্তিময় রাজ্যে পরিণত করিবে।

মা পৃথ্বীশমহিষি! আলেক্‌জেন্দ্রা! তুমি আজি স্বামী হারাইয়াছ! কিন্তু দেখ! মা! তোমার স্বামীর অসীম, অপরিচ্ছিন্ন, বিশ্বব্যাপী মহারাজ্যের অনন্ত কোটি প্রজা আজি একাধারে মাতা-পিতা-সুহৃৎ-সম্রাট্ সকলি হারাইল! "দুঃখং হি স্নিগ্ধজনসংবিভক্তং সহ্যবেদনং ভবতি"—একের দুঃখ যদি বহু স্নিগ্ধজনমধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে, তবে সে দুঃখের তীব্রতা সহনীয় হয়। তাই মা! আশা করি, আজি তোমার এ পতিশোক, তোমার অনন্তকোটি প্রজাপুঞ্জে সংবিভক্ত হওয়ায়, অবশ্যই তোমার সহনীয় হইবে। যেমন একটী সুবিশাল হ্রদের একপ্রান্তে আঘাত লাগিলে, তরঙ্গাবচ্ছিন্ন-তরঙ্গমালায় ক্রমে সমস্ত হ্রদবক্ষ আলোড়িত হইতে

থাকে, তেমনি আজি তোমার এ পতি-শোকে সমস্ত বিশ্বস্তরা বিক্ষোভিত। আজি সমস্ত বিশ্ববাসীর শোকসাগরে তোমার শোক বিলীন হউক। আজি সমস্ত বিশ্ব-বাসীর অশ্রুসাগরে তোমার অশ্রু বিলীন হউক। আজি কোটি কোটি মহাপ্রাণীর সহানুভূতি তোমাকে সান্ত্বনা দান করুক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ—
ওঁ শান্তিরেব শান্তিঃ।
॥ ওঁ তৎসৎ॥

সম্রাট্-বিয়োগ।

১

সিন্ধু অতিক্রমি ভারতবেলায়
কিসের নিনাদ আজিরে আসিল?
অসংখ্য লহরী উন্মত্তের প্রায়
কিসের বারতা আজিরে আনিল?

২

কুমারিকা হতে দূর হিমাচলে
কিসের সংবাদ চলেছে ছুটিয়া,
ত্রিংশ কোটি জীব মিলিয়া সকলে
চলেছে শোকের সঙ্গীত তুলিয়া।

৩

তাড়িত বারতা তড়িৎ-বেগেতে
দেশে দেশে আজ চলেছে ছুটিয়া
আবালবৃদ্ধ সবারে বলিতে—
"রাজা এডোয়ার্ড গেছেন চলিয়া।"

৪

নাইকো এ শোক রাখিবার স্থান
দুঃখী ভারতের আজি ঘরে ঘরে,
সন্তপ্ত সবার হৃদয় পরাণ
নয়নে নয়নে তীব্র অশ্রু ঝরে!

৫

মনে পড়ে আজ সে দিন আমার
সেই স্মৃতি আজো রয়েছে হৃদয়ে,
পঞ্চত্রিংশ বর্ষ পূর্ব্বেতে যাঁহার
দেখেছিনু মূর্ত্তি ভারত-আলয়ে।

৬

সেই শুভদিন সেই স্মৃতি তাঁর
ভুলিবে না কভু দরিদ্র ভারত,
সেই সমাদর, অভ্যর্থনা আর
গাবে চিরদিন—গাবে অবিরত।

৭

সেই "সিরাপিস" সুসজ্জিত তরী,
সেই মহাদৃশ্য "প্রিন্সেপ"-ঘাটেতে,
সেই তোপধ্বনি গঙ্গাবক্ষোপরি,
সেই রাজ্যে যারা দাঁড়ায়ে তীরেতে।

৮

সেই কলিকাতা-রাজপথশ্রেণী,
সেই দীপালোক "ওয়েলকম" আঁকা,
সেই আনন্দের মহা "হুরে" ধ্বনি
লোকের জনতা, উড্ডীন পাতাকা।

৯

মনে পড়ে সব—মনে পড়ে আজ।
মনে পড়ে সেই "কুমারের" মুখ,
মনে পড়ে আজ সেই রাজ-সাজ,
মনে পড়ে আজো সে দিনের সুখ।

১০

কি শুনিনু আজ—সেই নরপতি
আর নাহি আজ আমাদের তরে,
কি শুনিনু হায়! আজ সে মূরতি
গিয়াছেন নাকি এ পৃথিবী ছেড়ে!

১১

বৃটিশ প্রাসাদ, রাজসিংহাসন,
শূন্য আজ সব, রাজপরিবার,
শূন্য এ ভারত, বৃটিশভবন,
শূন্য প্রাণ মন আজিরে সবার!

১২

যে রাজ্যে তপন অস্তমিত নয়,
বৃটিশ পতাকা উড়িছে যথায়,
আজ সে তপন ম্লান, তমোময়,
আজ সে পতাকা উড়ে না তথায়।

১৩

গা'ব মোরা গা'ব—বিশ্বাস অন্তরে,
গা'ব তাঁর যশ গৃহেতে গৃহেতে,
ভারতনিবাসী গা'বে সমস্বরে,
যশোগীত তাঁর দেশেতে দেশেতে।

১৪

ভারত ঈশ্বরী—ভারতজননী
ভারতের ভার যাঁহার হাতেতে,
ছিল বহুদিন—তাঁর চিত্রখানি
আজি এ দুর্দ্দিনে আসিছে স্মৃতিতে।

১৫

ভারতমহিষী—"আলেকজান্দ্রিয়া"
না জানি কি শোকে শোকাকুলা-
আজ!
যাই পদধূলি মস্তক পাতিয়া
কাঁদি আজ সবে ধরি শোকসাজ!

১৬

আমাদের শোক বলিবার নয়,
আমাদের এই দরিদ্র কুটীরে
দারুণ আঘাতে আহতহৃদয়,
কাঁদি সবে আজি দুঃখী পরিবারে।

১৭

ভুলিবার নয়—কভু না ভুলিব,
"রাজভক্তি" ধর্ম্ম শিখেছি আমরা,
যত দিন মোরা থাকিব বাঁচিয়া
বলিব রাজারে বিধাতার গড়া।

১৮

বলিব বলিব বলিব আমরা—
বৃটিশ-মহিষী "আমাদের মাতা"
মহিষীনন্দনে দীন দুঃখী মোরা
স্মরিয়া গাইব যশের কথা।

১৯

ইচ্ছা হয় আজ যাই সিন্ধুপারে
পাখীর মতন উড়ে যাই তথা,
ইচ্ছা হয় আজ দেখি যাই তাঁরে,
মনে পড়ে আজ সে দিনের কথা।

২০

সেই রাজমুখ—আনত উষ্ণীষ,
উৎসাহপূর্ণ প্রশান্ত মূরতি,
সেই রাজপথে প্রজার আশীষ,
মনে পড়ে আজ সে দিনের স্মৃতি।

২১

কি বলিব আর—তাঁর অভিপ্রায়
আমাদের কিছু নাই বলিবার,
আমাদের মন্ত্র,—সকল সময়
"পূর্ণ হোক ইচ্ছা দয়াল পিতার"।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

নববর্ষের আত্মকথা।

আমি আসিয়াছি। আমি বঙ্গদেশের "নববর্ষ", বঙ্গদেশে আসিয়াছি। শুভ্র ধূমকেতুর পতাকা লইয়া, পবিত্রা মন্দাকিনীর জলে স্নান করিয়া, উষার নবারুণরাগে রঞ্জিত হইয়া আমি আসিয়াছি। তোমরা হরি হরি বল!

কালচক্র ঘুরিতেছে। ক্ষণ নাই, মুহূর্ত্ত নাই, অবিরাম ঘুরিতেছে। তাহার সঙ্গে দিবা, রাত্রি, বার, মাস, বর্ষ, যুগ সবই ঘুরিতেছে; তাহার সঙ্গে মানব-জগতের উত্থান-পতন ঘটিতেছে, মানব জাতির সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য যাতায়াত করিতেছে। আমরা নির্লিপ্ত, দূর হইতে সবই দেখিতেছি।

আমি আসিয়াছি। আমি নূতন হইয়া আসিয়াছি, সকলে আমাকে নূতন বলিয়া আদর করিতেছে, নূতন বলিয়া আমার সঙ্গে নূতন ভালবাসাবাসি করিতেছে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমি নূতন নহি। আমি এ জগতে না আসিলেও আমাদের আবাসস্থান ঐ দূর নন্দনবন হইতে জগৎখানি অনেক দিন হইতে লক্ষ্য করিয়াছি। যাঁহারা আমার পূর্ব্বগামী, সেই সকল বর্ষমহোদয়দিগের নিকটে জগতের তত্ত্ব অনেক শুনিয়াছি, কাজেই অনেক শিখিয়াছি; সেই জন্য এ জগতে অবতীর্ণ হইবার বহু পূর্ব্বে আমি অজ্ঞাত, অপরিচিত জগদ্বাসীকে হৃদয়পূর্ণ সহানুভূতি দিতে পারিয়াছি, তাই বলি, "নূতন" বলিয়া আমার কাছে তোমরা কোনরূপ সঙ্কুচিত হইও না। নূতনের আদর অভ্যর্থনা বেশী হইলেও যাহা ভালবাসা, যাহা মমতা, যাহা প্রকৃত আত্মীয়তা, তাহা তো পুরাতনেরই অধিকৃত। আমাকে নূতন বন্ধু বলিয়া আদর আপ্যায়িত করিতে চাও কর, কিন্তু প্রাণে গ্রহণ করিবার সময়ে পুরাতন জানিয়াই করিও।

এদেশে আসিয়া আমি বড়ই মুগ্ধ, বড়ই স্নিগ্ধ হইয়াছি। এ জগৎ বড়ই মনোহর, বড়ই শিষ্টাচারপূর্ণ। আমাকে আসিতে দেখিয়া প্রকৃতিদেবী নীল আকাশে সোণালী বসন পাতিয়া দিয়াছে, "বউ কথা কও" পাখী মেঘে মেঘে ছুটিয়া মধুর ধারা ছড়াইতেছে, সৌরভমাখা মৃদুল পবন অমৃতলহরী তুলিতেছে, ফুলে ফুলে বাগান আলো হইয়াছে, ফলে ফলে গাছের শির লুটিয়া পড়িতেছে, লতা-পাতায় সোণামণি ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে, দুর্ব্বাঘাসের উপরে মুক্তা জ্বলিতেছে, নদনদী কুলুকুলু তানে লহরে লহরে নাচিয়া চলিতেছে, অচির-জাগ্রত জীবগণ আনন্দোচ্ছ্বাসভরে আমার প্রতি নেত্রপাত করিতেছে, আর জীবকুলশ্রেষ্ঠ মানব মঙ্গলবিধাতার নামে আমাকে অভ্যর্থনা করিতেছে! মরি! মরি! হে সুন্দর, হে মধুর, হে প্রেমময় জগৎ! আমি কি দিয়া তোমার এ সহৃদয়তার প্রতিদান করিব?

আমি আসিয়াছি; কিন্তু কেন আসিয়াছি তাহা জানি না। গ্রহ, উপগ্রহ, সমুদ্র, পর্ব্বত, জীবজন্তু, স্থাবর-জঙ্গম, যত কিছু—যাঁহার আদেশে সবই আসে, সবই থাকে, আবার কাজ ফুরাইলে সবই যায়, আমি তাঁহারই আদেশে আসিয়াছি,থাকিব, এবং যথাসময়ে চলিয়া যাইব। এ যাতায়াতের কারণ তিনিই জানেন, আমি কিছুই জানি না। মানব আমাকে ভাগ্যবিধাতা বলিয়া থাকে, কিন্তু হায়! আমি ক্ষুদ্র, আমি জড়, আমি নিয়োজিত, আমি মানবের ভাগ্যবিধাতা হইবার শক্তি কোথায় পাইব? যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভাগ্যবিধাতা, তিনি আমারও ভাগ্যবিধাতা, আমারও নিয়ন্তা। যিনি অসীম ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনা করিতেছেন, তিনিই আমার পরিচালক। অতএব আমার বর্ত্তমান সময়ে তোমাদের যদি সৌভাগ্য ঘটে, তাহাতে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিও না, আবার যদি দুর্ভাগ্য ঘটে, তাহাতেও আমাকে গালি দিও না। আমার কথা "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ইহাই মনে রাখিও।

আমি কাজ করিতে আসিয়াছি, কাজ করিয়া যাইব। তোমরাও কাজ করিতে আসিয়াছ, কাজ করিয়া যাইও। তোমাদের এক বঙ্গকবির সঙ্গে সকলে বল,

"মাটির শরীর, মাটিতে মিশিবে
বিফলে মিশিবে কেন?"

এই বলিয়া নব বল সঞ্চয় করিয়া নব জীবনপথে অগ্রসর হও।

শোক-সঙ্গীত।

ইমন-পূরবী—একতালা।

সহিতে নারিত যেই কারো শোক
কোনো কালে।
সে আজ জড়ায়ে দেছে এ ভূলোক
শোক জালে॥
জগতের সুসন্তান,
এড্ওয়ার্ড মহাপ্রাণ,
ক্লান্ত দেহে শান্তি তরে পশিয়াছে
অস্তাচলে।
সসাগরা বসুন্ধরা,
হইয়াছে শোকাতুরা,
ভারত-মঙ্গল-ঘট ভেঙ্গে গেল যে
অকালে॥
শুনিল না কোন কথা,
বুঝিল না মর্ম্মব্যথা,
নিঠুর কালের ডাকে না বলে সে
গেল চ'লে।
আঁধার আঁধার ধরা,
জীবন্ত হয়েছে মরা,
রাজা প্রজা ভাসিতেছে সকলি
নয়নজলে॥

গেছ যদি ভবপার,
পাছু না ডাকিব আর,
হোক তব শান্তিলাভ হে রাজন্
অবহেলে।

তোমারি ও সিংহাসনে,
তোমারি ও পুত্রধনে,
বসায়ে রাখিব দেব! তোমারে গো
স্মৃতিমূলে॥

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ।

শিশুদের খাদ্য।

সাধারণতঃ বাঙ্গালীর ছেলেরা বড়ই শীর্ণ ও ক্ষীণজীবী হইয়া থাকে। বদ্ধ বায়ুতে ও সঙ্কীর্ণ স্থানে বাস, বাল্যবিবাহ, অকালমাতৃত্ব, খাদ্যদোষ, দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা কারণে শিশুদের শীর্ণতা উপস্থিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়, শিশুদের খাদ্য সম্বন্ধে মাতৃগণের অজ্ঞতা ও অনবধানতা এবং শিশুদের খাদ্যে পুষ্টিকর উপকরণের অভাব এই শীর্ণতার একমাত্র কারণ।

শিশু শীর্ণ হইলেই অনর্থক কতকগুলি ঔষধ না খাওয়াইয়া বিনা ঔষধে কেবলমাত্র শিশুর খাদ্যাদির বিষয়ে যত্নবতী হইলে অধিকাংশ স্থলেই যে শিশু হৃষ্ট পুষ্ট, কান্তিসম্পন্ন ও প্রফুল্ল হয়, এ কথা সকল মাতারই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সকলেই অবশ্য অবগত আছেন যে, শিশুর উপযোগী খাদ্য তাহার নিজের মাতৃদুগ্ধ। এই মাতৃস্তন্য আবার ঠিক নিয়মমত (দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর) ঘণ্টা হিসাব করিয়া খাওয়ান চাই। শিশু ঘুমাইলেও ঠিক সময়ে জাগাইয়া খাওয়ান উচিত। শিশু প্রতিবার পনর মিনিট হইতে কুড়ি মিনিট স্তন্যপান করিবে। দেরিতে দেরিতে স্তন্যপান করাইলে মাতৃদুগ্ধে জলীয় ভাগ অধিক হইয়া পড়ে এবং পুষ্টিকর পদার্থ কম থাকিয়া যায়। আবার ঘন ঘন স্তন্য পান করাইলে অথবা একবারে অধিক খাওয়াইলে শিশু পরিপাক করিতে পারে না, সুতরাং এই দুই কারণেই উদরাময় জন্মিয়া শীর্ণতা উপস্থিত করে। ছেলে কাঁদিলেই অনেক প্রসূতি স্তন্যপান করান, কেন কাঁদিতেছে বুঝিবার চেষ্টাও করেন না, ইহাতে অজীর্ণ ও উদরাময় হইয়া থাকে।

কোনও কারণে শিশু নিজের মাতার দুগ্ধে বঞ্চিত হইলে, সুসভ্য ও ধনীদের গৃহে স্তন্যদায়িনী ধাত্রীর (Wet nurse) স্তন্যপান করান হয়। কিন্তু নীরোগ ও চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষিত ধাত্রী (Wet nurse) রাখিয়া ছেলে মানুষ করা সাধারণ গৃহস্থের সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই জন্য ডাক্তার আর্মষ্ট্রং (Dr. Armstrong) বলেন যে, গাভীদুগ্ধ তাঁহার উপদেশানুযায়ী জল

মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলেও শিশুর পুষ্টি-সাধনপক্ষে ব্যতিক্রম ঘটে না। তাঁহার মতে প্রথম সপ্তাহ হইতে প্রতিবার এক তোলা দুগ্ধ ও আধ ছটাক জল আরম্ভ করিতে হইবে এবং শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধের মাত্রা বাড়াইয়া ও জলের মাত্রা কমাইয়া, তিন মাস বয়সে দেড় তোলা দুগ্ধ ও দেড় তোলা জল, ছয় মাস বয়সে সাড়ে চারি তোলা দুগ্ধ ও দেড় তোলা জল, নয় মাসে তিন ছটাক দুগ্ধ ও দেড় ছটাক জল, এইরূপে নয় মাস বয়সে শিশু সমস্ত দিনে আড়াই সের পর্য্যন্ত দুধ খাইয়া পরিপাক করিতে পারিবে। তিন ঘণ্টা অন্তর প্রাতে ৬টা হইতে রাত্রি ১০ট পর্য্যন্ত ছয়বার খাইবে, এবং রাত্রিতে একবারমাত্র খাইবে। শিশু দুই একবার "দুধ তুলিলেই" দুগ্ধের মাত্রাধিক্য মনে করিয়া দুধ কম খাওয়ান উচিত নহে। ছোট চামচের (Tea spoon) একচামচ চুণের জল দিনে দুই তিন বার দুধের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলেই "দুধ তোলা" সারিয়া যাইবে।

অনেক শিশু নিয়মমত গাভীদুগ্ধ খায়, কিন্তু শীর্ণ থাকিয়া যায়। তাহাদিগকে দিনে একবারমাত্র ছোট-চামচের এক চামচে কাগজি বা কমলালেবুর রস খাওয়াইলে, শিশু দুধ উত্তমরূপে পরিপাক করে ও শীঘ্রই হৃষ্ট পুষ্ট হয়।

যদি শিশু জলমিশ্রিত গাভীদুগ্ধ চারি পাঁচ দিন খাইয়া আর খাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তবে মেলিন্সফুড্ (Mellin's food) বা হরলিক্স মল্টেড্ মিল্ক্ (Horlick's malted milk) ছোট চামচের এক চামচে মাত্রায় জলমিশ্রিত গাভীদুগ্ধ সহ দিনে দুই তিন বার দিলে এই অরুচি অচিরে বিনষ্ট হয়।

অনেকে পাতলা বার্লি (Barley water) সহ দুধ খাওয়ান, কিন্তু ছোট শিশুদের ইহাতে কোন উপকার হয় না, কারণ ছোট শিশুরা বার্লির শ্বেতসার (Starch) পরিপাক করিতে পারে না। ফলতঃ গাভীদুগ্ধের সহিত জল মিশাইয়া খাওয়ানই ভাল। বার্লি দিনে ৪-৫ বার প্রস্তুত করিতে হয়, নচেৎ ইহা দুধ অপেক্ষা শীঘ্র অম্ল হইয়া যায়। আর অম্ল বার্লি খাওয়াইলে কুফলই উৎপন্ন হয়।

অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, গাধার দুধ খুব বলকারক। এই জন্য শিশু গাভীদুগ্ধ পরিপাক করিতে সমর্থ, অথবা যথেষ্ট পরিমাণে মাতৃদুগ্ধ পাইলেও এবং শিশু হৃষ্টপুষ্ট থাকা সত্ত্বেও দিনে একবার বা দুইবার অল্প মাত্রায় গাধার দুধ কোন কোন ধনী লোকের গৃহে শিশুকে খাওয়ান হয়। ইহা অনাবশ্যক। কেবলমাত্র গাধার দুধ খাওয়াইলে শিশু শীর্ণ হইবার সম্ভাবনা; কারণ গাধার দুধে পুষ্টিকর উপাদান অতি অল্প। যে সকল শিশু দুগ্ধের প্রোটিড্ (Protied) নামক উপাদান ও মাখন (Milk-fat) পরিপাক করিতে অসমর্থ হওয়াতে উদরাময় রোগাক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া পড়ে, তাহাদের পক্ষে গাধার দুধ উপযোগী ও

উপকারী সন্দেহ নাই। গাধার দুগ্ধে মাতৃদুগ্ধ বা গাভীদুগ্ধ অপেক্ষা অনেক কম মাখন ও প্রোটিড্ থাকে বলিয়া উদরাময়গ্রস্ত শিশু উহা শীঘ্র হজম করিতে পারে।

শিশুদিগের উদরাময় ও শীর্ণতার জন্য বহুকাল হইতে তক্র অর্থাৎ ঘোল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যে সকল শিশু দুগ্ধের প্রোটিড ও মাখন উভয় উপাদানই পরিপাক করিতে অসমর্থ, তাহারা এই তক্র অতি সহজে হজম করিতে পারে। তবে আমাদের দেশের ঘোল বলিতে যাহা বুঝায়, তদ্রূপ ঘোল শিশুকে খাওয়ান হইবে না; কারণ তাহা বাসি ও শিশুদের পক্ষে দুষ্পাচ্য। বিশুদ্ধ ও টাট্কা তক্র প্রস্তুত করিবার অনেক প্রকার বিজ্ঞানানুমোদিত প্রকৃষ্ট উপায় আছে, কিন্তু সেরূপ তক্র প্রস্তুত করা সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে অসম্ভব। টাট্কা ও বিশুদ্ধ তক্র প্রস্তুত করিবার একটী সহজ উপায় এস্থলে দেওয়া গেল। তিন পোয়া গরম দুধে একটু দুগ্ধশর্করা অথবা সাধারণ চিনি বা মিশ্রি গুলিবেন এবং এই দুধের সহিত ছোট চামচের এক চামচে এসেন্স অব্ রেনেট্ (Essence of Rennet) মিশাইয়া একটী কাচের গ্লাসে রাখিবেন। ঠাণ্ডা হইলে মাখন তুলিবার যন্ত্র (মূল্য ॥০ আনা মাত্র) দ্বারা ননী তুলিয়া লইলেই ঐ দুধ ব্যবহারোপযোগী হইবে। অম্ল হওয়ায় দুগ্ধের প্রোটিড্ পদার্থ শীঘ্র হজম হইবে এবং ননী তুলিয়া লওয়ায় এই তক্র শিশুর পক্ষে অতীব সুপাচ্য হইবে।

যে সকল শিশু দুগ্ধের প্রোটিড্ পদার্থ একেবারে হজম করিতে পারে না, তাহাদের অতিশয় কষ্টদায়ক উদরাময় উপস্থিত হয়। ছেনা ছেনা দাস্ত হয়, শিশু পেটের বেদনায় প্রায় সর্ব্বদাই কাঁদে এবং মাঝে মাঝে পেটের কামড়ানি অত্যধিক হইলে শিশু অস্থির হইয়া উঠে। এরূপ হইলে গাভীদুগ্ধ পেপ্টোনাইজ্ (Peptonise করিয়া খাওয়াইলে শিশু সহজে হজম করিতে পারে, উদরাময় প্রভৃতি আরোগ্য হয় এবং শিশু ত্বরায় পুষ্টিলাভ করে। দুগ্ধ পেপ্টোনাইজ্ করা সকলের পক্ষে সুবিধাজনক নহে, তথাপি ইহার প্রস্তুতপ্রণালী জানিয়া রাখা ভাল। সকল ঔষধালয়েই এক টাকায় ১২টী পেপ্টোনাইজিং পাউডারের টিউব অর্থাৎ ছোট শিশি পাওয়া যায়। একটী বোতলে আড়াই আউন্স বা সওয়া দুই ছটাক শীতল জল রাখিয়া তাহাতে একটী টিউবের অর্দ্ধেকটা গুড়া ফেলিয়া বোতলটী নাড়িয়া গুলিয়া লইবেন এবং দশ আউন্স বা পাঁচ ছটাক টাট্কা ও বিশুদ্ধ গাভীদুগ্ধ বোতলে ঢালিয়া দিবেন ও ঝাঁকি দিয়া উত্তমরূপ মিশাইয়া লইবেন। তারপর হাত সয় এরূপ গরম জলে বোতলটী দশ মিনিট কাল আকণ্ঠ ডুবাইয়া রাখিবেন। দশ মিনিট পরেই ঐ দুগ্ধ বোতল হইতে একটী এনামেল-করা পাত্রে ঢালিয়া অগ্নিসন্তাপে রাখিবেন এবং দুগ্ধ ফুটিয়া উঠিলেই পাত্রটী

নামাইয়া রাখিবেন। ঠাণ্ডা হইলে দুধ কাপড়ে ছাঁকিয়া বোতলে ঢালিয়া বোতলের মুখে কর্ক দিয়া শীতল জলে আকণ্ঠ ডুবাইয়া রাখিবেন। শিশুকে খাওয়াইবার সময় বোতল হইতে ঢালিয়াই খাওয়াইবেন, আর গরম করিতে হইবে না। এইরূপ প্রস্তুত করা দুধ ৭৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত খাওয়ান চলে। আট ঘণ্টার অধিক রাখিলে নষ্ট হইয়া যায়।

আবার কোন কোন শীর্ণতাপ্রাপ্ত শিশুর উদরাময়ের পরিবর্ত্তে কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা যায়। এরূপ হইলে যকৃতের দোষ প্রভৃতির জন্য ভীত হইবার পূর্ব্বে একবার শিশুর খাদ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। শিশুর পানীয় দুগ্ধে অধিক জল থাকিলে বা দুগ্ধের উপাদানগুলি সমস্ত বর্ত্তমান না থাকিলে এইরূপ হইয়া থাকে। শিশু কেবল জল খাইয়া একরূপ অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে থাকে, সেই জন্যই শীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা উপস্থিত হয়। নির্জ্জল দুগ্ধ খাওয়াইয়াও যদি শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা না সারে, তাহা হইলে হঠাৎ ঔষধ ব্যবহার না করিয়া শিশুর খাদ্যের নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করিলে সুফল পাওয়া যাইবে। একটী লম্বা বোতল নির্জ্জল দুগ্ধে পূর্ণ করিয়া বসাইয়া রাখিবেন, দুই ঘণ্টা পরে বোতলের দুধের উপরের দুইভাগ মাত্র লইবেন এবং তাহার সহিত টাট্‌কা মাখন ও একটু দুগ্ধশর্করা মিশাইয়া খাওয়াইলে শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা সারিয়া যাইবে।

শীর্ণতার জন্য অনেকে শিশুদিগকে কড্‌লিভার অয়েল খাওয়াইতে বলেন; কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায়, এক্সট্রাক্ট অব মল্ট (Extract of malt, মিশাইয়া দুগ্ধ খাওয়াইলে অধিক ফল দর্শে।

বিবিধ ব্যঞ্জন।

মা লক্ষ্মি! পাঠিকাগণ!

গত রাত্রে কঠোর শিরঃপীড়ায় চিত্তবিনোদনার্থে এই কয় পঙ্‌ক্তি লিখিয়া তোমাদিগকে উপহার দিতেছি। এ বৃদ্ধ ও লোভী ব্রাহ্মণের রসনালালসা-রোগ বড় প্রবল। ইহার প্রতীকার তোমাদেরি হস্তে। আশা করি, তাহাতে বঞ্চিত হইব না।

কদলি! তোমার গুণ করিতে কীর্ত্তন,
হারি মানে ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবগণ;
কদলি! মরতে তুমি সুরকল্পতরু.
উদ্ভিজ্জ-জগতে তুমি সকলের গুরু;
আপাদমস্তক তব সর্ব্ব-অঙ্গচয়,
সকলি অমৃত, কিছু ফেলিবার নয়!
কাঁচা পাকা কলা-থোড়-মোচা আদি করি,
সকলি মধুর তব, আহা মরি-মরি!
তব খোলা, তব পত্র সম পাত্র নাই,
সুবর্ণ-হীরক-পাত্র তার কাছে ছাই।

তব পাত্রে লোকে যদি করে পিণ্ডদান,
পিতৃলোক তাহে সুধাধিক তৃপ্তি পান।
রজকের ক্ষার হয় তব শুষ্ক ছাল,
পাকা কলা হেরি কার নাহি পড়ে লাল?
তোমা হ'তে সূক্ষ্ম সূত্র করি নিকাশন,
বুনিছে চিকণ বস্ত্র বৈজ্ঞানিকগণ।
আ মরি! কদলীবন কিবা শোভা ধরে!
দূর হ'তে হেরিলেই সর্ব্ব শ্রান্তি হরে।
নবপত্রিকারে তাই পূজা করে নরে,
মহোৎসবে সবে তাহা রোপে ঘরে ঘরে।

ডুমুর! তোমারে খেয়ে নাহি মিটে আশ,
তুমি না থাকিলে ভাই! সব ছাই পাঁশ।
ঝোলে-ঝালে ডালনায় তুমি সর্ব্বঘটে,
বড়ই বিভ্রাট, তুমি না থাকিলে ঘটে।
ভাজা, বড়া, চড়চড়ি সর্ব্বঘটে স্থান,
তুমি না থাকিলে ভিটা শ্মশান-সমান।

ছানা মুড়কি যদি পাই শান্তশীলা-হাতে,
যত খাই তত তুলি হাতে আর পাতে। (১)
টাট্‌কা ভাজা পোনামাছ, দধিমাখা ভাতে,
পেলে আমি পেট ভুলে খাই দুই হাতে।
ইলিশের মুড়া দিয়া পুঁই-শাক-ডাঁটা,
পেলে পলান্নের আমি মুখে মারি ঝাঁটা।
গরম অরহরদাল, ফুলবড়ি ভাজা,
পাতে পেলে রাজভোগ ভুলে যায় রাজা।
কলায়ের দাল সহ চিংড়িভাজা পেলে,
আকণ্ঠ ভরিয়া খাই স্বর্গসুধা ফেলে।
কাদাচিংড়ি উচ্ছে ডুমুর—কাঁটালের বীচি,
তার সঙ্গে আলু আর পটলের কুচি,
গোটা দিয়া তাহে যদি রাঁধে চড়চড়ি,
তবে তাহে মুখে অন্ন উঠে তড়বড়ি।
শীতের নূতন গুড়ে পাকা চালিতায়—
অম্বল রাঁধিলে, হয় সুধার সুতার।
বলিহারি! নারি! তব লোভসম্বরণ!
তোমার ধৈর্য্যের কথা না যায় বর্ণন;
আমি হ'লে তোপসে মাছ ভাজিবার কালে
টপাটপ্ জোড়া জোড়া পূরিতাম গালে।
বোল্‌ছি নিশ্চয়, আমি হ'লে নারীজাতি,
"হাঁড়িখাকী"বোলে মোর ঘুষিত সুখ্যাতি;
এদেশে নারীর বেলা যত কিছু পাপ,
পুরুষ হইলে তার সাত খুন মাপ।
পুরুষের পক্ষে বিধি দশ গণ্ডা বিয়া,
বালবিধবার পক্ষে 'ব্রহ্মচর্য্য'-ধুয়া।

আলু-মূলা-শিম-বড়ি-বেগুনের শুক্ত,
খাইলে মানব হয় সর্ব্বরোগমুক্ত।
সজিনার ডাঁটাসহ নিমপাতা-ভাজা,
ঘৃত-ভাত সহ খেয়ে পাই দ্বি'শ মজা!
বড়ি ভাতে, বড়ি ভাজা, দাল-বড়া-ঝোল,
বড়ি চড়চড়ি আর বড়ির অম্বল,
খাঁটি তেল, নুন আর কাঁচা লঙ্কা দিয়া,
বীচাবড়ি পোড়া খাই উদর পূরিয়া।
দালবাটা লাউপাতে বাঁধি পোড়াইয়া,
কেহ যদি খায় তেল-লুণ-লঙ্কা দিয়া,
তবে তার ঘুচে যায় সমুদায় রোগ,
গরাসে গরাসে পায় স্বর্গসুধা-ভোগ।
বড়ি বিনা তরকারি গোময়সমান,
বড়ির মহিমা-সীমা ব্রহ্মা নাহি পান।
কটু তৈল, কাঁচা লঙ্কা, লুণ যদি পাই,
ঝোড়া-ঝোড়া বেগুন্-পোড়া বীচাবড়ি খাই।
দয়াময়ী পাঠিকারে কি জানাব আর?
দুটী দুটী বড়ি মোরে দিও উপহার।

(১) শান্তশীলা—স্বর্গীয় উমেশচন্দ্রের লক্ষ্মী-রূপিণী জ্যেষ্ঠা কন্যা।

এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণে বড়ি যে করিবে দান,
অক্ষয় বৈকুণ্ঠলোকে সে লভিবে স্থান।
ইলিশের দাগা লাউপাতে জড়াইয়া,
ঝাঁঝাল সরিষাবাটা তাহে মিশাইয়া,
ধানিলঙ্কাপাতা তাহে দিয়ে দুই চারি,
রাশীকৃত উষ্ণ অন্ন ঢাল তদুপরি,
ভুমেভুমে সিদ্ধ তাহা হইবে যখন,
খেয়ে দেখো পাঠিকারা সে লাগে কেমন!
শপথ করিয়া আমি বলিবারে পারি,
তাই দিয়া দশ হাঁড়ি ভাত আমি মারি।
গোটা দিয়া শাকভাজা যদি দুটী পাই,
লেবুরস মেখে ভাত হাঁড়ি-হাঁড়ি খাই।
কনকনোটের ঝোল খায় যে রমণী,
রক্তপ্রদরাদি তার পলায় অমনি।
শীতের পয়ড়াগুড়ে পরমান্ন পেলে (১),
ছুটে গিয়াচুমুক্ মারি কাল্‌য়ে কোপ্তা ফেলে,
ঝুনা নারিকেল সহ টাট্‌কা মোটা মুড়ি,
পেলে আমি খেয়ে ফেলি দশ বিশ ঝুড়ি।
গৃহজাত গব্যঘৃত চড়ায়ে কড়ায়,
আদাকুচি দিয়া যদি চিড়া ভাজা যায়,
গরম গরম তাহা যে করে ভোজন,
হাতে হাতে মোক্ষলাভ করে সেই জন।
হাবড়হাটি তরকারি বোঁটা-বাক্‌লা দিয়া,
তাহে মৎস্যমুণ্ড-কাঁটাপোঁটা মিশাইয়া,
ছেঁচড়া রাধিয়া যে না করেছে ভোজন,
বৃথাই তাহার ভবে মানব-জনম।
চালকলাইভাজা যদি গোটামাখা হয় (২)
দেখিলেই টস্‌টস্ মুখে লাল বয়।
লেবু-চিনি-লুণ-সহ ঘোল দিলে মুখে,
এক খোরা মেরে দেই একই চুমুকে।
সরিষাবাটনা দিয়া কচি-ঝিঙা-ঝোল,
বোবার বদনে দিলে ফোটে তার বোল।
শীতরাত্রে লাউচিংড়ি বড়ি দিয়া রাঁধা,
পর দিনে পেলে পতি পায়ে থাকে বাঁধা।
লাউ দিয়া সোণামুগ পায়সের মত,
যত পাই তত খাই, লোভ বাড়ে তত।
লাউপাতা, লাউডগা নধর নধর,
হেরি' মোর মুখে লাল পড়ে ঝরঝর,
কাঁচাই খাইয়া ফেলি হেন ইচ্ছা হয়,
রন্ধন করিতে তাহা বিলম্ব না সয়!
এ লোভী ব্রাহ্মণে যেই দিবে লাউডাঁটা,
যমের দুয়ারে তার পড়িবেক কাঁটা।
কচি আমড়া-চিংড়ি দিয়া অম্বল যে খায়,
অরুচি বিতৃষ্ণা তার সুদূরে পলায়।
কচি কলাই শুঁটি বড়ি দিয়া লাউঝোল,
বোবার বদনে দিলে ফোটে তার বোল।
নূতন চেলের ভাত ফেনের সহিত,
গৃহজাত ঘৃত তাহে করিয়া মিশ্রিত,
বড়ি ও বেগুন আর ঝিঙা-মূলা ভাতে,
হেন রাজভোগ যেই দেয় পতিপাতে
কি,কহিব সে নারীর সৌভাগ্যের কথা!

(১) 'পয়ড়া গুড়'—জিয়ান কাটের টাটকা সুগন্ধি পাতলা গুড়।

(২) গোটার প্রচলন সকল স্থানে আছে কি না জানি না। আমাদের দেশের মেয়েরা বৈশাখে শুভ দিন দেখিয়া পল্লীবাসিনী সকলে মিলিয়া, শঙ্খ-হুলুধ্বনি সহকারে গোটা ও কাসুন্দি কুটিয়া থাকেন। প্রস্তুত হইলে, সর্ব্বাগ্রে মনসাপূজার জন্য যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দেন। ইহা আমিষ বা নিরামিষ যে ব্যঞ্জনে দিবে, তাহাই সুস্বাদ হইবে। গোটা মাখিয়া মুড়ি ও চালকলাই ভাজা খাইতে বড়ই সুস্বাদ।

জনমে সে কভু নাহি পায় কোনো বাথা ।
"তরুণং সর্ষপশাকং
নবৌদনং পিচ্ছিলানি চ দধীনি ।
অল্পব্যয়েন সুন্দরি !
গ্রাম্যজনো মিষ্টমশ্নাতি ॥"
—কচি সরিষার শাক, নব অন্ন, ঘৃত,
গৃহের তরল দধি,—এ সব অমৃত,
হে সুন্দরি ! অনায়াসে অল্প ব্যয় করি,
পাড়াগেঁয়ে লোক সবে খায় পেট ভরি ।
(সহুরে পত্নীর প্রতি পাড়াগেঁয়ে পতির উক্তি) ।
পোস্তবাটা ডুমুরের সহ মিশাইয়া,
মচমচে ভাজা বড়ি তার সঙ্গে দিয়া,
আলু সহ রঙ্গে রসে করিয়া রন্ধন,
মুখে দিলে ঘুচে যায় এ ভববন্ধন ।
ইলিশ কাসুন্দি দিয়া করিলে রন্ধন,
অমৃত ফেলিয়া তাহা খায় দেবগণ ।
কচুর ডাঁটার ঘণ্ট ছোলার সহিত,
নারিকেলকুরা তাহে করিয়া মিশ্রিত,
দুগ্ধ, মিষ্ট, স্বল্প মরীচের গুঁড়া দিয়া,
আনন্দে খাইবে তাহা আকণ্ঠ ভরিয়া,
বিশেষতঃ মম সম গুলিখোর যারা,
কোষ্ঠশুদ্ধি পক্ষে পাবে উপকার তারা ।
বিলাতি কুমড়াফুল কিম্বা বকফুল,
বেসমে ভাজিলে তৈলে, খাইতে অতুল ।
রসবড়া, ভাজাপুলি দশবিশ গণ্ডা
পেলে আমি খেয়ে ফেলি, ফেলি' লুচি মণ্ডা ।
কুলচুর, আমসত্ব যদি আমি পাই,
যাহা কিছু বলিলাম, সব ভুলে যাই ।
কুলচুর পাথরবাটীতে ভিজাইয়া,
লেবুরস-নুণ-চিনি তাহে মিশাইয়া,
গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নের ভোজনের শেষে
বাটী সহ মুখে তুলি' টানিবে নিঃশেষে ।
থোড়, বড়ি, খাঁড়া, তারি ওড়ন-পাড়ন,
তাহাতেই নানারূপ যে রাঁধে ব্যঞ্জন,
রমণীর শিরোমণি হয় যে রমণী,
তার গুণ গাই আমি দিবস-রজনী ।
যার ঘরে নারিকেল আর গাভী রয়,
অতিথি-কুটুম্ব এলে তার কিবা ভয় ?
নারিকেল-কুরা সহ গুড় মিশাইয়া,
গরম গরম নাড়ু প্রস্তুত করিয়া,
গরম মুড়ির সহ যে খায় সে নাড়ু,
ময়রার দোকানে সে মারে ছ'শ ঝাড়ু ।
কল্পবৃক্ষ, রত্নাকর, কুবের-বৈভব,
নারিকেল ! তব কাছে সব পরাভব ।
কচি, দুর্‌মা, ঝুনা আদি নারিকেল যত,
প্রত্যেকে অমূল্য গুণ ধরে শত শত ।
একমাত্র নারিকেল খাও শাঁসে-জলে,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, ক্লান্তি সব যাবে চলে ।
মধ্যাহ্নভোজন করি' যদি ডাব খাও,
অম্ল আদি নানারোগে সদ্য শান্তি পাও ।
পাতা, কাটি, ডাল,পালা, ফল, খোল, শাঁস,
লোকের অশেষ কার্য্যে লাগে বার মাস ।
কাঁদি কাঁদি নারিকেল পাতায় মণ্ডিত,
হেরিলেই মন প্রাণ হয় পুলকিত ।
নারিকেল খোলে হুঁকা করিয়া নির্ম্মাণ,
তবে ত ধরিছে প্রাণ বঙ্গের সন্তান ।
নারিকেল ! তব পদে কোটি নমস্কার !
তব খোলে শত কোটি প্রণতি আমার ।
তব খোলে ভুড়ু ভুড়ু তামাকু টানিয়া,
বৈকুণ্ঠের সুখ পাই মরতে বসিয়া ।
প্রস্তুত করিলে রজ্জু তব ছোবড়ায়,

বড় বড় জাহাজ তাহাতে বাঁধা যায়।
তব তৈল কতশত লাগে উপকারে,
কার সাধ্য তব গুণ বর্ণিবারে পারে?
কি কহিব তব তৈল কত গুণ ধরে?
হাঁপ-যক্ষা আদি রোগে উপকার করে।
তুমি তাই পড়িলেও কোটার ভিতরে,
হিন্দুরা তোমাকে কভু ছেদন না করে।
নারিকেল! তব মূলে যে হানে কুঠার,
ব্রহ্মহত্যা-গোহত্যা-পাতক হয় তার।

বৈদ্যশাস্ত্রে নারিকেলের অশেষ গুণ-কীর্ত্তিত হইয়াছে। নারিকেলের ন্যায় মহোপকারী পদার্থ আর নাই। নানা অবস্থায় ইহার নানা গুণ। নারিকেল-মাত্রই পিত্তাদি দোষ নাশ করে। কচি নারিকেলের গুণ,—লঘুত্ব, শীতলত্ব, পিত্ত-পীনস তৃষা-অস্র-বিদাহ-ভ্রান্তি-শোষ প্রভৃতির শমনকারী। পক্বনারিকেলের জলের গুণ,—মধুরত্ব, দীপনত্ব, বলকরত্ব, বৃষ্যত্ব ও বীর্যবর্দ্ধনত্ব প্রভৃতি।

"বিশেষতঃ কোমলনারিকেলং
নিহন্তি পিত্তজ্বরমূত্রদোষান্।"

কোমলাবস্থায় ইহা ভোজন করিলে, পিত্তজ্বর ও মূত্রদোষাদি নিবারিত হয়।

"তস্যাম্ভঃ শীতলং হৃদ্যং দীপনং শুক্রলং লঘু।
পিপাসাপিত্তজিৎ স্বাদু বস্তিশুদ্ধিকরং পরম্॥"

—কচি নারিকেলের জল স্নিগ্ধ, হৃদ্য, অগ্নিবর্দ্ধন, শুক্রপ্রদ ও শীঘ্র পরিপাক হয়। ইহা পিপাসা ও পিত্তদোষ হরণ করে ও কোষ্ঠশুদ্ধি করে। নারিকেল, তাল ও খর্জ্জুরের মাথি যেমন সুস্বাদু, তেমনি হিতকর। নারিকেলের এইরূপ অশেষ গুণ জানিয়াই ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরা ইহার ছেদনকে মহাপাপ বলেন। আবার নারিকেল হইতে যে ক্ষীর অর্থাৎ রসকরা, লাড়ু, চন্দ্রপুলি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, তাহা যেমন সুস্বাদ, তেমনি উপকারক।

"নারিকেলোদ্ভবা ক্ষীরী স্নিগ্ধা শাতাতি-পুষ্টিদা।
গুর্ব্বী সুমধুরা বৃষ্যা রক্তপিত্তানিলাপহা॥"

এ জগতে নারিকেলের ন্যায় অমূল্য পদার্থ আর নাই। সিংহল, মান্দ্রাজ প্রভৃতি দেশে পাকাদি কার্য্য নারিকেল তৈলে সম্পন্ন হয়। ঐ সকল অঞ্চলের লোক নারিকেল হইতে অপূর্ব্ব মাখম ও ঘৃতাদি প্রস্তুত করে। নারিকেলের মালা ও পত্রাদি ঐ সকল দেশে রন্ধনকাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। তাড়াতাড়ি কিছু পাকাদি করিতে হইলে, নারিকেল-পাতায় তাহা সম্পন্ন হয়। প্রবীণ ডাক্তারেরা বলিয়াছেন,—যে সকল কাসাদি রোগে কডলিবার অয়েল্ ব্যবহৃত হয়, সে সকল স্থলে তৎপরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ নারিকেলতৈল অধিকতর হিতকর ও হৃদ্য। যোগি-সন্ন্যাসীরা পবিত্র বিবেচনায় নারিকেল-খোল কমণ্ডলুরূপে ব্যবহার করেন। চট্টগ্রাম প্রভৃতি সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থানে এক একটী নারিকেলে আট-দশ সের জল ধরে। নারিকেল-মাথি খাইতে সুস্বাদ ও নানা পীড়ায় উপকারী।

সর্ব্বোপরি ইহার পত্রবিচ্ছিন্ন কাটি। ঐ কাটির সমষ্টি শুধু গৃহমার্জ্জনাদি কার্য্যের উপযোগী নহে। উহা গৃহিণী-

দেবী একটীবার দেখাইলেই, তাঁহার অবাধ্য গতিটী পদানত হন।

নারিকেলের এই সকল গুণ দেখিয়াই শাস্ত্রকারেরা ইহার ছেদনকে এত মহাপাপ বলিয়াছেন। গৃহনির্ম্মাণের সময় তথায় নারিকেলবৃক্ষ থাকিলে গৃহস্থ তাহা ছেদন না করিয়া, ছাদ ফুঁড়িয়া তাহা রক্ষা করিয়া থাকেন। ভারতের বিখ্যাত ইতিহাসলেখক এলফিনিষ্টোন সাহেব লিখিয়াছেন, "যে দেশের একটী ফলের, ভিতর দুইখানি রুটি ও এক গেলাস সরবৎ পাওয়া যায়, তথায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা কি? (১)। বস্তুতঃ প্রত্যহ এক-একটী পরিপুষ্ট নারিকেলের শাঁসে ও জলে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির জীবন ধারণ হয়। ধন্য নারিকেলবৃক্ষ! ধন্য তোমার জীবন! তোমার তুলনা মিলে না। তোমার তুল্য কৃতজ্ঞও আর নাই। একজন কবি সত্যই বলিয়াছেন,—

"প্রথমবয়সি দত্তং তোয়মল্পং স্মরন্তঃ
শিরসি নিহিতভারা নারিকেলা নরাণাম্।
সলিলমমৃততুল্যং দদ্যুরাজীবনান্তং
নহি কৃতমুপকারং সাধবো বিস্মরন্তি॥"

—নারিকেল বীজাঙ্কুর আছিল যখন,
অল্পমাত্র জলসেক পাইল তখন,
সেই উপকার দেখ! করিয়া স্মরণ,
মস্তকে ফলের ভার করিছে বহন,
দিতেছে অমৃতজল যাবৎ জীবন,

(১) দুই খানি রুটি—দুই মালা শাঁস। এক গেলাস সরবৎ—নারিকেল-জল।

উপকার পেয়ে নাহি ভুলে সাধুগণ।

যত মধু শাক-শস্য-লতায় পাতায়,
তত মধু নাহি মিলে অন্যত্র কোথায়,
'মাংস' অর্থে আমি যারে করিব আহার,
পরজন্মে আমি ভক্ষ্য হইব তাহার (১)।
মল-মূত্র-শ্লেষ্মা আদি ঘৃণার ভাজন,
মৎস্যজাতি সে সকলি করয়ে ভোজন।
অতএব মৎস্যমাংস যে করে ভোজন,
একাধারে সর্ব্বভোজী হয় সেইজন।
বিশেষতঃ পর্য্যুষিত হয় যে আমিষ,
রোগের কীটাণু তাহে করে গিসগিস।
চতুর্দ্দিকে মারিভয় হয় যে সময়,
পচা মাছ-মাংস সে সময় বিষময়।

(১) "মাংস ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহং।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
যো বন্ধনবধক্লেশান্ প্রাণিনাং ন চিকীর্ষতি।
স সর্ব্বস্য হিতপ্রেপ্সুঃ সুখমত্যন্তমশ্নুতে॥
যদ্ধ্যায়তি যৎ কুরুতে ধৃতিং বধ্নাতি যত্র চ।
তদবাপ্নোত্যযত্নেন যো হিনস্তি ন কঞ্চন॥
(মনু, ৫ অধ্যায়।)

—ইহ জন্মে আমি যাহার মাংস ভোজন করিতেছি, পরজন্মে সে আমাকে ভক্ষণ করিবে। পণ্ডিতেরা 'মাংস'-শব্দের মাং—আমাকে, 'সঃ' সে ভোজন করিবে, এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

—যিনি প্রাণিগণকে বধবন্ধনাদি ক্লেশ দিতে চাননা, যিনি সর্ব্বভূতহিতৈষী, সেই লোক চিরকাল অনন্ত সুখ ভোগ করেন।

—যিনি জীবমাত্রেরই হত্যায় বা পীড়নে পরাঙ্মুখ, তিনি যাহা ধ্যান করেন, যে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং যে পরমার্থতত্ত্বের অনুসন্ধানে মন দেন, সে সমুদায়ই তিনি অনায়াসে লাভ করিতে পারেন।

সাত্ত্বিক আহার যার সাত্ত্বিক আচার,
আগাগোড়া সব কাজ সাত্ত্বিক যাহার,
সদাই সাত্ত্বিকভাবে অটল যে জন,
সে হয় আরোগ্য আয়ু সৌভাগ্য-ভাজন।
মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা ভারতললনা!
অন্নপূর্ণারূপে করি তোমারি অর্চ্চনা।
হাতা-বেড়ি ছাড়ি' যবে ধরেছ কেতাব,
তদবধি অন্ন-জলে দিয়াছি জবাব।
জান ত দ্রৌপদী, সীতা আদি বামাগণ,
পৃথ্বীশমহিষী যাঁরা ত্রৈলোক্যভূষণ,
প্রভাতে যাঁদের নাম করিলে কীর্ত্তন,
অশেষ দুরিত দূরে করে পলায়ন;
যাঁহাদের দাসদাসী ছিল অগণন,
করিতেন নিজে তাঁরা সানন্দে রন্ধন,
সে-অন্ন-ব্যঞ্জন-সুধা করিয়া ভোজন,
লভিত অতুল তৃপ্তি লক্ষ লক্ষ জন।
তাই তাঁহাদের নাম অক্ষয় অক্ষরে—
তারাপুঞ্জ সম দীপ্ত ত্রৈলোক্য-ভিতরে।
অশুচি, মলিন-দেহ, মলিন বসন,
উড়িয়া-মেড়ুয়া যত বিকৃতদর্শন,
নাহি করে শৌচকার্য্য, না ছাড়ে বসন,
তাহাদেরি হাতে আজি প্রাণ সমর্পণ (১)।
তাই আজি ঘরে ঘরে রোগের সঞ্চার,
ইচ্ছামৃত্যু আমাদের, দোষ দিব কার?
শুন! বলি সনাতন শাস্ত্রের আচার;—
পিতৃতুল্য-হস্তে দিবে অন্তঃপুর-ভার;
মাতৃতুল্য যতনে যে করা'বে আহার,
অর্পিবে তাহারি হস্তে রন্ধনের ভার;
আত্মতুল্য জনে দিবে গোধন সেবন,
কৃষি-ব্যবসায়ে নিজে করিবে গমন। (১)
প্রিয়তম পতি-পুত্র প্রাণের দোসর,
তাদের জীবন-মৃত্যু যাহার উপর,
হেন কার্য্য হেয় জ্ঞান করে যেই নারী,
তাহার মূঢ়তা আমি বর্ণিবারে নারি।
জগতজননী যিনি 'অন্নপূর্ণা'—নাম,
যাঁহার স্মরণে লোক পায় মোক্ষধাম,
স্থালী-দর্ব্বী হস্তে তিনি করিয়া ধারণ,
অমৃতান্ন পতিপাত্রে করেন অর্পণ।
এ মূর্ত্তি পূজিত যথা হয় ঘরে ঘরে,
সে দেশ ঘৃণিত হস্তে অন্ন খেয়ে মরে!!!
অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা জননী আমার,
যাঁর আবির্ভাবে ছিল সোণার সংসার,
যাঁর স্নেহসুধা ক্ষুধা হরিত সবার,
বিশোক হইত লোক দরশনে যাঁর,
যাঁর হাতে অমৃতান্ন করিয়া ভোজন,
লভিত মুমূর্ষু রোগী নবীন জীবন, (২)

(১) "প্রাণসমর্পণ'—প্রাণ অর্থাৎ অন্ন, তাহারি ভারার্পণ। অন্ন ও প্রাণ একই পদার্থ। "অন্নং বৈ প্রাণাঃ "-অন্নই জীবের প্রাণ; "অন্নং ব্রহ্ম" অন্ন ব্রহ্ম। এই অন্ন যে নারী ভক্তিপূর্ব্বক দান করেন, তিনি প্রাণদাত্রী প্রাণময়ী মা।

(১) "পিতুরন্তঃপুরে দদ্যান্মাতুর্দদ্যান্মহানসে।
গোষু চাত্মসমং দদ্যাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ॥"
(পরাশরসংহিতা।)

(২) মৃতকল্প বহু ব্যক্তি আমার মাতৃহস্তের ভোগের প্রসাদ ভোজন করিয়া অসাধ্য রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। মহারাণী শরৎসুন্দরীর গুরুদেব ৺দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য, বিখ্যাত সোমপ্রকাশসম্পাদক ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ৺ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, আমাদের গ্রামের জমিদার বসুবাবুরা প্রভৃতি অনেকে ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। এজন্য তদীয় হস্তের অন্ন "অন্নপূর্ণার

দুর্গা-প্রতিমারে যিনি করিলে বরণ,
দুর্গা ছাড়ি' তাঁরে সবে করিত দর্শন (১)
মন প্রাণ-আত্মা হৈতে উথলিত যাঁর--
সর্ব্বজীবে সমভাবে স্নেহ-পারাবার।
আগাগোড়া অণু-পরমাণুটী যাঁহার—
অমৃত—অমৃত আহা! অমৃতের সার।
মাগো! তুমি অভাগারে ছেড়েছ যে দিন,
তদবধি অন্নহীন আমি দীনহীন।

(পরিশিষ্ট)

বলিতে ভুলেছি যাহা ব্যঞ্জনের সার,
কিছুই রোচেনা মুখে অভাবে যাহার,
অপূর্ব্ব ব্যঞ্জন সেই একমাত্র ক্ষুধা,
যাহার অভাবে মুখে তিক্ত লাগে সুধা।

মহাভারতীয় উদ্যোগপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র বিদুর-সংবাদে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোন্ শ্রেণীর লোক কিরূপ আহার করে এবং কোন্ ব্যঞ্জন সর্ব্বোৎকৃষ্ট? বিদুর কহিলেন,—

"আঢ্যানাং মাংসপরমং মধ্যানাং
গোরসোত্তরম্।
তৈলোত্তরং দরিদ্রাণাং ভোজনং ভরতর্ষভ!'
সম্পন্নতরমেবান্নং দরিদ্রা ভুঞ্জতে সদা।
ক্ষুৎ স্বাদুতাং জনয়তি সা চাঢ্যেষু সুদুর্লভা॥
প্রায়েণ শ্রীমতাং লোকে ভোক্তুং
শক্তির্ন বিদ্যতে?'
জীর্য্যন্ত্যপি তু কাষ্ঠানি দরিদ্রাণাং
মহীপতে!॥

—মাংসই ধনীর পক্ষে ভক্ষ্যের প্রধান,
মধ্যবিত্ত বেশি বেশি ঘৃত দুগ্ধ খান।
তৈলপক্ক শাকশস্য দরিদ্র ভোজন,
ত্রিবিধের পক্ষে এই ভক্ষ্যের সাধন।
দরিদ্রই করে সর্ব্ব উত্তম ভোজন,
ধনিগণ নাহি জানে ক্ষুধা যে কেমন।
ক্ষুধাই ভোজনে করে স্বাদুতা-উদ্ভব,
হেন ক্ষুধা ধনিকুলে বড়ই দুর্লভ।
সারাদিন খেটে খেটে জ্বলিত ক্ষুধায়—
দরিদ্র-জঠরে কাষ্ঠ পরিপাক পায়।

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। "ভোগে রোগভয়ং; "যত ভোগ, তত রোগ,—ভোগেই রোগের ভয়। ইহার একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমার কোনও বন্ধু ছিলেন, তিনি মফস্বলস্থ বিপুলঐশ্বর্য্যশালী রাজা। অনিয়ত ভোগে উৎকট ও অসাধ্য উদরীরোগে আক্রান্ত হইয়া, চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আসিয়া কাশীপুরের গঙ্গাতীরস্থ উদ্যানবাটীতে ছিলেন। তাঁহার জলবিন্দুও উদরস্থ করিবার শক্তি ছিল না। একটু কিছু খাইলেই যাতনায় হাঁইফাঁই করিতেন। আমি এক

প্রসাদ" বলিয়া দেশে অদ্যাপি খ্যাত। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহোদয় আমার মাতা-পিতার স্বর্গারোহণে, সোমপ্রকাশপত্রিকায় তাঁহাদের অলৌকিক আধ্যাত্মিক মহিমার কথা উন্মুক্তপ্রাণে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

(১) দুর্গাপ্রতিমাবিসর্জ্জনকালে, আমার পিতামহপ্রমুখ বহু প্রবীণ লোক তথায় সমবেত হইয়া, আমার মার প্রতিমাবরণ দেখিতেন এবং পিতামহকে বলিতেন,—"ও তর্কপঞ্চানন! কোন্ প্রতিমা দেখিব? তোমার বৌমার কাছে যে মা দুর্গা সত্য সত্যই মাটি হইয়াছেন।"

দিন বৈকালে তাঁহাকে দেখিতে যাই। আমরা উভয়ে গঙ্গার দিকে বারেণ্ডায় বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম। তিনি বৃহৎ ইজি চেয়ারে শয়ানভাবে ছিলেন। ইত্যবসরে একজন মুটে, সারাদিন মোট বহিয়া, গঙ্গার ঘাটের পার্শ্বে আসিল, এবং তথায় ইট কুড়াইয়া উনান পাতিল। তাহার কঠোর শ্রমলব্ধপয়সায় সে কতকগুলি মোটা চাউল, একটা বেগুন, একটা লঙ্কা, একটু লবণ ও একটী হাঁড়ি কিনিয়াছিল। সে উনান জ্বালিয়া, হাঁড়ি চড়াইল এবং তাহাতে জল ও চাউল ঢালিয়া দিল, চাউলগুলা সে ঝাড়িল না, ধুইল না। এইজন্যই বলিয়া থাকে,—

"ক্ষুধাতুরাণাং নচ চাল ঝেড়ে,
তৃষ্ণাতুরাণাং নচ ডোবা গেড়ে।"

অর্থাৎ ক্ষুধাতুর ব্যক্তি আর চাউলগুলি ঝাড়ে না, বাছে না, অমনি হাঁড়িতে ঢালিয়া দেয়। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি আর ভাল মন্দ জল বাছে না, সম্মুখে ডোবা প্রভৃতি যাহাতে জল দেখে, তাহা হইতে জলপান করে। যখন হাঁড়িতে ভাতগুলি টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল, তখন তাহার আহ্লাদ দেখে কে? সে আনন্দ তাহার মুখমণ্ডল ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল! সে বিস্ফারিতনেত্রে, সতৃষ্ণভাবে তাহা দেখিতে লাগিল, ইচ্ছাটা যেন হাঁড়িশুদ্ধ উদরস্থ করে। অনন্তর পাত পাতিয়া সমস্ত ভাত পাতে ঢালিল। দুই চারিটা ভাত যাহা হাঁড়ির গায়ে লাগিয়াছিল, তাহাও যত্নপূর্ব্বক খুঁটিয়া লইল। সিদ্ধ বেগুনটী অতিযত্ন পূর্ব্বক আঙুলের টিপ দিয়া ভাঙ্গিয়া লইল। সেই তৈলহীন বেগুনে লঙ্কা ও একটু লবণ দিয়া মাখিয়া লইল। এক্ষণে ভোজনের পালা। লম্বা-চৌড়া হাতের চেটো ভরিয়া এক এক থাবা ভাত ও এক এক বার সেই লঙ্কা-বেগুনের এক একটু সংযোগ, যেন সে কোদাল দিয়া মাটি তুলাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ক্ষণমধ্যে সে অন্নরাশি অদৃশ্য।

অনন্তর জলপূর্ণ বৃহৎ লোটা মুখের উপর তুলিয়া, গলগল শব্দে জলধারাপাতন। জলপানের সময় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত, নয়নদ্বয় আনন্দভরে নিমীলিত। যেন সে সারাদিনের সমস্ত ক্লেশরাশি খাসিয়া ফেলিতেছে! অনন্তর সেই গঙ্গাতরঙ্গ সঙ্গ-শীতল-সান্ধ্য-সমীর-সেবিত তটে শাণের উপর "পপাত চ মমার চ"—যেমন শয়ন, অমনি ঘোর নিদ্রায় অচেতন।

সেই পীড়িত রাজা বাহাদুর ও আমি, উভয়ে একাগ্রভাবে সেই দৃশ্যটী দেখিলাম। রাজা বাহাদুর বিষণ্ণবদনে একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—অহো! এই মুটিয়া কি ভাগ্যবান্! আমি বহুকাল আহার-নিদ্রায় বঞ্চিত। নিজ জীবন কেবল যাতনা দ্বারাই অনুভব করিতেছি। আমার সমস্ত রাজবৈভবের বিনিময়ে ঐ মুটিয়ার স্বাস্থ্য লাভ করিলে, আমি আপনাকে মহাসৌভাগ্যশালী জ্ঞান করি। "সুখানাং খলু সর্ব্বেষামারোগ্যং সুখ-

মুত্তমম্।"—এ জগতে আরোগ্যই সর্ব্ব-সুখের প্রধান। শরশয্যাশায়িত, জ্ঞানসমুদ্র ভীষ্মদেবকে যুধিষ্ঠির "কিং সৌখ্যম্ ?"—সুখ কি? জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন,—

"অরোগিতা জগতি জন্তোঃ"

অর্থাৎ, আরোগ্যই জীবের সুখ। (১)

সভ্যতাভিমানী, বহুশাস্ত্রপাঠী আমরা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, যাহাদিগকে মুটে মজুর ইতর লোক বলিয়া ঘৃণা করি, তাহারাই সুখী। তাহারা অকপট, সুস্থ-কায়, সাধারণতঃ সত্যবাদী। তাহাদের প্রকৃতিবিকৃতি প্রায় সভ্যসংসর্গে ঘটিয়া থাকে। আমি একদা ধর্ম্মতলায় একটা বৃহৎ আলমারি ক্রয় করিয়া কয়েকটা মুটের দ্বারা গৃহে আনিতেছিলাম। সন্ধ্যার সময়, গ্রীষ্মকাল, হঠাৎ ঝড় উঠিল, ধূলা উড়িল। আমি চক্ষু মুদিয়া দাঁড়াইলাম। মুটেরা ধূলার ভয়ে পার্শ্বের গলিতে প্রবেশ করিল। আমি চাহিয়া দেখি, আলমারি সহ মুটেরা অদৃশ্য। তখনি আমি,—যাঃ! মুটেবেটারা আলমারি লইয়া পলাইল, বলিয়া, হাঁকাহাঁকি-ছুটোছুটি করিতে লাগিলাম। মুটেদের প্রতি আমার সে মিষ্ট সম্ভাষণ তাহারা শুনিয়াছিল। অনন্তর আমার কাছে আসিয়া বলিল,—কর্ত্তা! আপনি ভাবিলেন, আমরা আলমারি লইয়া পলাইলাম। বাবু! আমরা মুটে মজুর ছোট লোক, দিন আনি, দিন খাই, প্রবঞ্চনা প্রতারণা-ঠকামোর ধার ধারি না। সে সব কাজ, যাহাদের লম্বা কোঁচা, তাহাদের। আমি নিজের কাণ মলিয়া বলিলাম,—ঠিক্ বলেছে বাবা! আমাদের মধ্যে কেহ যদি কাপ্তেন ভাসাইয়া (মনিবের সর্ব্বনাশ করিয়া) ধুমধাম নবাবি করে, তবে সে সমাজে বড় কৃতী, ক্রিয়াবান্, দাতা, ভোক্তা বলিয়া সম্মান পায়। আর দরিদ্র বেচারা অসহ্য জঠরানলে দগ্ধ ও মৃতকল্প হইয়া, যদি একমুষ্টি তণ্ডুল চুরি করে, তবে তাহার ভাগ্যে প্রথমতঃ হাড়ভাঙ্গা প্রহার, পশ্চাৎ শ্রীঘরদর্শন। "দেবতার বেলা লীলা খেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা"। বড় মানুষ দেবতা। তাঁহাদের কোনও পাপ স্পর্শে না।

কোনও চিকিৎসকের নিকট গিয়া কিছুক্ষণ বসিলেই দেখিবে, অধিকাংশ রোগীরই অভিযোগ,—পরিপাক হয় না, রাত্রে নিদ্রা হয় না। এরূপ রোগীদিগকে প্রবীণ ও অশেষশাস্ত্রবিশারদ ডাক্তার নবীনচন্দ্র পাল বলিতেন,—

"খাইলে অশেষ ব্যাধি, না খাইলে মরি,
অল্পাহার অল্পনিদ্রা, সর্ব্বকালে তরি।"

অতিভোগাসক্ত ব্যক্তিরাই জীবের জীবন স্বরূপ আহার-নিদ্রায় বঞ্চিত হয়।

"রাজানং কামিনং চৌরং প্রবিশন্তি প্রজাগরাঃ।"

(১) "কো ধর্ম্মো ভূতদয়া কিং সৌখ্যমরোগিতা জগতি জন্তোঃ
কঃ স্নেহঃ সদ্ভাবঃ কিং পাণ্ডিত্যং পরিচ্ছেদঃ॥
(মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।)

রাজা, কামুক ও চোরেরা নিদ্রাসুখে বঞ্চিত।

ক্ষমাময়ী পাঠিকাগণ! কি বলিতে গিয়া কি বলিলাম। অন্নব্যঞ্জনের কথায় কত কি বলিয়া ফেলিলাম। বুড়ো বামনের উপর রাগ করিও না। ঘড়ির কথাটা যেন মনে থাকে।

কস্যচিৎ বৃদ্ধব্রাহ্মণস্য।

সেণ্টপলের পত্রাবলী।(১)

রোমীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রতি।

১ অধ্যায়।

১১। তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমি একান্ত উৎসুক, যেহেতু তোমাদিগকে কিছু আধ্যাত্মিক সম্পত্তি দিতে চাই, তাহা হইলে তোমরা ধর্ম্মে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

১২। অর্থাৎ তোমাদের এবং আমার উভয়ের বিশ্বাস দ্বারা আমি সুখী হইব—তোমরাও হইবে।

১৬। খ্রীষ্টের সুসমাচারপ্রচারে আমি লজ্জিত নহি; কারণ ইহা প্রত্যেক বিশ্বাসীর পরিত্রাণার্থ ঐশী শক্তি; ইহার প্রথম অধিকারী ইহুদি, কিন্তু গ্রীকও ইহার অধিকারী।

১৭। ঈশ্বরের ধর্ম্মজ্যোতি বিশ্বাস হইতে বিশ্বাসে অনুপ্রকাশিত; কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে, ধার্ম্মিকেরা বিশ্বাস দ্বারা জীবিত থাকিবে।

১৮। যে সকল মনুষ্য ঈশ্বরের সত্য লাভ করিয়া পাপাচারে রত রহিয়াছে, তাহাদিগের নাস্তিকতা ও পাপাচারের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের রুদ্রভাব প্রকাশিত হইবে।

১৯। কারণ, ঈশ্বরের বিষয়ে যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা তাহাদিগের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে; কারণ ঈশ্বর স্বয়ং ইহা তাহাদিগকে দেখাইয়াছেন।

২০। কারণ, পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি ঈশ্বরের অদৃশ্য বিষয় সকল—তাঁহার অনন্ত শক্তি এবং ঈশতা পর্য্যন্ত সৃষ্ট পদার্থ-সকলে সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া বোধগম্য হইতেছে। অতএব পাপাচারীদিগের আত্মসমর্থনের পথ নাই।

২১। কারণ, যখন তাহারা ঈশ্বর বলিয়া জানিল, তাহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মহীয়ান্ করিল না এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইল না; কিন্তু তাহারা আপনাদিগের কল্পনায় আপনারা গর্ব্বিত হইল এবং তাহাদিগের কদর্য্য হৃদয় অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন হইল।

(১) বহুকাল গত হইল, প্রাতঃস্মরণীয় বামাবোধিনীসম্পাদক স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত এই প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পুরাতন কাগজপত্র মধ্যে ইহা প্রাপ্ত ও অবিকল প্রকাশিত হইল।

২২। আপনাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহারা ঘোর মূর্খ হইল।

২৩। তাহারা নির্ব্বিকার পরমেশ্বরের মহিমা, বিকারশীল মানব, পক্ষী, চতুষ্পদ এবং সরীসৃপের মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়া মলিন করিল।

২৪। তাহাদের নিজের হৃদয়ের কু-প্রবৃত্তি এবং পরস্পরের দেহের অশুচিতা দ্বারা অপবিত্র হইল—ইহাই তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের দণ্ড।

২৫। তাহারা এমন নির্ব্বোধ, যে, তাহারা ঈশ্বরের সত্যকে মিথ্যাতে পরিণত করিল, এবং চিরধন্য পরমেশ্বরকে অবহেলা করিয়া সৃষ্ট বস্তুর পূজা ও সেবা শ্রেষ্ঠতর করিয়া মানিল।

৩২। যাহারা পাপকর্ম্ম করে, ঈশ্বরের বিচারে তাহারা মৃত্যুদণ্ডার্হ, ইহা জানিয়াও তাহারা যে কেবল পাপকার্য্যসকল করিতেছে তাহা নহে; কিন্তু সেই সকল কার্য্যে আনন্দানুভব করিতেছে।

২য় অধ্যায়।

১। হে বিচারক মনুষ্য! তুমি যে কেহ হও না কেন, তোমার মাপ নাই:—কারণ যদ্দ্বারা তুমি অন্যকে বিচার করিতেছ, তদ্দ্বারা তুমি আপনাকে দণ্ডার্হ করিতেছ; কারণ তুমি বিচারক, নিজেই সেই সকল অপকর্ম্ম করিতেছ।

২। আমরা নিশ্চয় জানি, যে, যাহারা এরূপ কর্ম্ম করে, ঈশ্বরের ন্যায়-বিচার তাহাদিগের বিরুদ্ধে।

৩। হে মানব! তুমি অন্যের পাপের বিচারকারী হইয়া আপনি সেই পাপ করিতেছ, অথচ তুমি কি মনে করিতে পার, যে, তুমি ঈশ্বরের দণ্ড এড়াইবে?

৪। অথবা ঈশ্বরের সাধুতা, ক্ষমা এবং দীর্ঘ সহিষ্ণুতা অবজ্ঞা করিতেছ; তুমি কি জান না, যে ঈশ্বরের এই দয়া তোমাদের অনুতাপ করিবার জন্য সুযোগ দিতেছে?

৫। কিন্তু যতই তোমার হৃদয় কঠিন এবং অনুতাপবিহীন, ততই মহাবিচারের দিনের জন্য ঈশ্বরের ক্রোধ এবং দণ্ডবিধান ঘনীভূত করিতেছ।

৬। ঈশ্বর প্রত্যেক মানবের কার্য্যের ফলদান করিবেন।

৭। যাহারা যশ, গৌরব এবং অমরত্বের জন্য ধৈর্য্য সহকারে সাধুকার্য্যে নিয়ত রত থাকিবে, তাহাদিগকে ঈশ্বর অনন্ত জীবন দিবেন।

৮। কিন্তু যাহারা বিবাদশীল এবং সত্যের অনুবর্ত্তী না হইয়া অধর্ম্মাচরণ করে, তাহারা ঈশ্বরের ক্রোধ ও দণ্ড-ভাজন হইবে।

৯। যে কেহ পাপাচরণ করিবে, তাহারি আত্মা ক্লেশ ও যাতনা অনুভব করিবে—ইহুদি প্রথমে, জেণ্টাইন অর্থাৎ অন্য জাতীয় ব্যক্তি পরে দণ্ডিত হইবে।

১০। যে কোনও ব্যক্তি সাধু আচরণ করিবে, সেই যশ, গৌরব এবং শান্তি

পাইবে—ইহুদি প্রথমে, অন্য জাতীয় ব্যক্তি পরে।

১১। ঈশ্বর ব্যক্তিবিশেষের পক্ষপাতী নহেন।

১২। যাহারা বিধিবিহীন হইয়া পাপ করিয়াছে, তাহারা বিনা বিধিতে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, এবং যাহারা বিধি জানিয়া করিয়াছে, তাহারা বিধি দ্বারা বিচারিত হইবে।

১৩। যাহারা কেবল বিধি শ্রবণ করে, তাহারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ন্যায়বান্ নয়, কিন্তু যাহারা বিধির অনুসরণ করে, তাহারাই ন্যায়বান্।

১৪। কারণ জেণ্টাইলদিগের বিধি না থাকিলেও, যখন তাহারা স্বভাবতঃ বিধিবিহিত কার্য্য করে, বিধি না থাকা সত্ত্বেও ইহাই তাহাদিগের পক্ষে বিধি।

১৫। বিধির মর্ম্ম যে তাহাদিগের হৃদয়ে লিখিত রহিয়াছে, ইহা দ্বারা তাহাই প্রকাশ পাইতেছে; বিবেক সাক্ষী এবং বিধি হইতে বিরহিত হইয়াও তাহারা পরস্পরকে দোষী বা নির্দ্দোষী বিবেচনা করিতেছে।

১৭। দেখ! তুমি আপনাকে ইহুদি বল এবং বিধির উপর নির্ভর কর এবং তোমার ঈশ্বরের নামে তুমি গর্ব্বিত।

১৮। তুমি বিধি হইতে শিক্ষা করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা জানিয়াছ এবং যে সকল বিষয় উৎকৃষ্টতর তাহাই ভাল বল।

১৯। তোমার বিশ্বাস যে তুমি অন্ধের পথপ্রদর্শক এবং যাহারা অন্ধকারে আছে, তুমি তাহাদিগের আলোক।

২০। তুমি বিধি হইতে জ্ঞান এবং সত্যের ছায়া পাইয়া নির্ব্বোধদিগের শিক্ষাদাতা ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের উপদেষ্টা হইয়াছ।

২১। অতএব তুমি অপরের শিক্ষক হইয়া আপনাকে কি শিক্ষা দিবে না? তুমি অপরকে উপদেশ দাও, চুরি করিও না, কিন্তু নিজে কি চুরি করিবে?

২২। তুমি অন্যকে বল ব্যভিচার করিও না, কিন্তু নিজে কি তাহা করিবে? তুমি পুত্তলিকাকে ঘৃণা কর, কিন্তু তুমি কি ধর্ম্মের অবমাননা করিবে?

গৃহকর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যে সকল স্ত্রীলোকদিগের পরিবারের অনেক দাসদাসী রাখিবার সঙ্গতি আছে, তাঁহাদের কাছে হয়ত ঘরের কাজ করা অতি ঘৃণিত বিষয়। বাল্যকাল হইতে তাঁহাদের ঐ সংস্কারটা তাড়াইতে পারিলে আমি যারপর নাই সুখী হইব। আমাদের দেশের গৃহিণীরা যদি সকলকাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের সংসারের সকল গোলযোগ চুকিয়া যায়। মনে মনে কর্ম্মজ্ঞান

কোনও কাজের নয়; আর গৃহকর্ম্মে উত্তমরূপে কার্য্যতঃ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, বাল্যকাল হইতেই অভ্যাস করা আবশ্যক। নতুবা বয়সকালে উহা শিক্ষা করা অতিশয় কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। মায়েরা যদি কন্যাদিগকে নিয়মিতরূপে প্রত্যহ দুচারটী সহজ গৃহকর্ম্ম করিতে দেন, তাহা হইলে তাহারা অধিকতর সুশৃঙ্খলার সহিত নিজ নিজ সংসার চালাইতে সক্ষম হইবে। তাহা না হইলে, শ্বশুরবাড়ী গিয়া ছোট ছোট বউদিগকে যে কি গঞ্জনা সহিতে হয়, আর পরজীবনে যে কত কষ্ট পাইতে হয়, তাহা যিনি একবার ভুগিয়াছেন, তিনিই জানেন।

পরিবারের মধ্যে দুই তিনটী মেয়ে থাকিলে সংসারের সহজ কাজগুলি তাহাদের মধ্যেই ভাগ করিয়া দেওয়া উচিত। পান সাজা, বিছানা করা, ঠাঁই-করা, পরিবেশন, ঘর ঝাঁট দেওয়া, অধিক কি, জলতোলা, ঘর ধোয়া ও বাসন মাজার কাজও বালিকাদিগকে শিখান আবশ্যক। কিন্তু উহা তাহাদিগকে এরূপ ভাবে শিখাইতে হইবে, যে, তাহাতে তাহারা কালব্যাজ করিলে চলিবে না। প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া যে যার নির্দ্দিষ্ট কাজ বুঝিয়া লইবে, উহা দায়িত্বের সঙ্গে ঠিক সময়ে শেষ করিতে বাধ্য হইবে। অবশিষ্ট কাল তাহারা লেখাপড়া ও খেলাতে কাটাইবে।

বাল্যাবস্থা হইতেই মেয়েরা গৃহকর্ম্মকে যেন অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া ভাবিতে শিখে। তাহা না হইলে, বড় হইয়া তাহারা কর্ত্তব্য কাজের অর্থ বুঝিতে পারিবে না। আমার মতে কন্যাদের নিজ নিজ ঘর পরিষ্কার রাখা, বিছানা করা, দোর জানালা ধোয়া, মেজে সাপ করা, আসবাব ঝাড়া প্রভৃতি কাজের জন্য স্বচ্ছন্দে তাহাদের উপরেই নির্ভর করা যাইতে পারে। আর প্রত্যহ দুএকটা ব্যঞ্জন রাঁধাও বালিকাদিগকে শিখাইবে। রোজ দুই তিন ঘণ্টা সময় গৃহকর্ম্মে দিলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। কেন না, গৃহকর্ম্ম স্ত্রীলোকের একটা প্রধান কাজ বলিয়া ধরা হইলেও, কোনগৃহিণী যে সমস্ত দিনই সংসার লইয়া ব্যস্ত থাকিবেন, এরূপ আমার অভিপ্রায় নয়। কারণ, স্ত্রীজাতি সংসারকাজের অপেক্ষাও উচ্চতর অন্যান্য কর্ম্মসাধনের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছে।

গৃহকর্ম্মের সঙ্গে জিনিষপত্র দেখাশুনা জামা-সেলাই প্রভৃতি কাজও ধর্ত্তব্য। বালিকারা প্রত্যহ নিয়মিতরূপে দুই তিন ঘণ্টা এইরূপে পরিশ্রম করিলে, অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদের বুদ্ধিশক্তি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিবে, কার্য্যতঃ জ্ঞানের সহিত তাদের পরিচয় হইবে। উহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকিবে। গৃহকর্ম্ম স্ত্রীলোককে নিজের হাত চালাইবার ন্যায় মন চালাইতেও শিখায়। সর্ব্বদা নারীজীবনের অন্যান্য উচ্চ কাজের মধ্যে থাকিলেও সে কখনও নিজ সংসারকে অবহেলা করিতে পারে না। হাজার শিক্ষিতা হইলেও সে, নারী ও পুরুষজাতির কর্ত্তব্য যে স্বতন্ত্র, সংসারের সুখ-শান্তি ও সুশৃঙ্খলতা যে গৃহিণীর যত্ন

ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে এ মহা-বাক্য কখন ভুলিয়া যায় না।

যাহা হউক, পুস্তকে কাজের পথ দেখাইয়া দিলেও উহাদ্বারা গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কেবল অভ্যাস বশতই উহাতে নিপুণ হওয়া যায়। তবে যে সব বালিকার পিতৃগৃহে মায়ের কাছে ঐ সকল কাজ শিখিবার সুবিধা নাই, আর যে মায়েরা নিজেই উহাতে অপটু, তাঁদের জন্য গোটাকতক কথা বলিলাম।

মিসেস্ ডি, এন, দাস।

নূতন সংবাদ।

১। এবার ১২জন বালিকা ইণ্টার-মিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছে। তন্মধ্যে ১ম বিভাগে ১টী, ২য় বিভাগে ১০টী ও তৃতীয় বিভাগে একজন উত্তীর্ণা হইয়াছে।

প্রথম বিভাগ।

এডোলিন্ বারেলো মেরি ঘোষ প্রাইভেট্।

দ্বিতীয় বিভাগ।

অমলা দাস	বেথুন কলেজ।
সুষমা বিশ্বাস	ডাওশেসন মিশন।
প্রীতিবালা ঘোষাল	বেথুন কলেজ।
আশালতিকা হালদার	বেথুন কলেজ।
বিভুবালা সরকার	বেথুন কলেজ।
বনলতা মজুমদার	প্রাইভেট।
জ্যোতির্ম্ময়ী রায়	প্রাইভেট।
নির্ম্মলা রায়	বেথুন কলেজ।
ভক্তিলতা চন্দ	বেথুন কলেজ।

তৃতীয় বিভাগ।

সুশীলা সেন	বেথুন কলেজ।

২। পরপ্রাণ রক্ষার্থ ভারতরমণীর অত্যাশ্চর্য্য আত্মত্যাগ।

গত ২৮শে বৈশাখ ১১ই মে অক্ষয়-তৃতীয়া ব্রতের দিন। ঐ দিবস এট্ওয়া-সন্নিকটবর্ত্তী যমুনাতীরে বহু লোকসমাগম হইয়াছিল। মালতীদেবী সরস্বতী নাম্নী কোনও এট্ওয়ানিবাসিনী রমণী, তথাকার কারাগারের কেরাণীর সহধর্ম্মিণী। তিনি তাঁহার চারিটী শিশুসন্তান সমভি-ব্যাহারে যমুনাসলিলে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। স্নানান্তে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহারা নদীতটে কোনও কৌতু-হলোদ্দীপক ক্রীড়া দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ অন্য একটী নারী চীৎকার করিয়া উঠিল, "রামচন্দ্র ডুবিয়া গেল, রামচন্দ্র (কেরাণীর জ্যেষ্ঠপুত্র) ডুবিয়া গেল ?" এই সময় সকলেই তথায় বিবিধ কৌতুকাবহ ক্রীড়াদি দর্শনে নিবিষ্ট; কিন্তু বস্ত্রালঙ্কারপরিহিতা মালতী দেবী সরস্বতী কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, এমন কি নিজের অমূল্য জীবনের দিকেও দৃক্-পাত না করিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই জলমগ্ন অষ্টমবর্ষীয় রামচন্দ্রের উদ্ধারের জন্য জলে

ঝাঁপ দেন এবং ঐ বালকের হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করেন। তিনি তাঁহার পিতৃদেবকে লিখিয়াছেন, "সেখানে জল আমার অত্যন্ত গভীর বোধ হইল, কিন্তু স্রোতে আমরা তথা হইতে অন্যত্র নীত হইয়াছিলাম। সেখানে অনেক সুদক্ষ সাঁতারী ও ডুবুরী-কর্ত্তৃক আমরা তীরে নীত হই।" মালতী দেবী, সাঁতার জানিতেন না, (তিনি তাঁহার পিতাকে, লিখিয়াছেন, "আপনি জানেন যে, আমি কখনও সাঁতার দেই নাই, এবং কখনও নদীতে স্নান করিতে ভাল বাসি না। যদি কখনও ইহাতে স্নান করি, তখন আমি জলে ডুব দিই না বরং কোনও পাত্র দ্বারা জল উঠাইয়া মস্তকে ঢালিয়া দেই।)" তথাপি ঐ শিশুর প্রাণরক্ষা করিবার জন্য তাঁহার করুণ প্রাণে এরূপ সাহসের সঞ্চার হইয়াছিল, যে জল আর তাঁহার নিকট জল বলিয়া প্রতীত হয় নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন শুধু ঐ শিশুর জীবন। তাঁহার উদ্ধার-প্রতিজ্ঞা এরূপ প্রবল, যে বালকের হাত ধরিবার পরে, তিনি জ্ঞানহীনা হইয়াছিলেন, তথাপি বালকের হস্ত, তাঁহার দৃঢ়মুষ্টির বহির্ভূত হয় নাই। আশ্চর্য্য!!!

অনন্তর ভগবৎকৃপায় ও চিকিৎসকের সাহায্যে তাঁহারা উভয়েই জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন। গত বৎসরের সেই দ্রুত-গমনশীল ট্রেণ হইতে মাতার তাঁহার পুত্রের উদ্ধারের জন্য ঝাঁপ প্রদান এক্ষণে আমাদের স্মরণপথে আরূঢ় হয়। সেই ঘটনাটীও আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু স্বার্থজড়িত; কিন্তু বর্ত্তমান ঘটনাটী নিঃস্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা। ভারত দরিদ্র বটে, কিন্তু যথার্থ ধনে,—প্রেমধনে যাহাতে ধনী হইতে পারে ইহাই জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

৩। বি, এ পরীক্ষায় সর্ব্বসমেত ৪১২জন উত্তীর্ণ হইয়াছে; তন্মধ্যে ৬জন বালিকা।

আণ্টন মোজেল	স্কটিস চার্চ কলেজ।
মিস্ লৌরা সুনীতি ঘোষ	ডাওশেসনমিশন কলেজ।
মেরী বণার্জ্জি	বেথুন কলেজ।
শিশিরকুমারী গুহ	বেথুন কলেজ।
বিভা রায়	বেথুন কলেজ।
জ্যোতির্ম্ময়ী দত্ত	বেথুন কলেজ।

বেথুন কলেজ হইতে এবার এই চারিজনই বি, এ, পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিল। ঈশ্বরকৃপায় সকলেই উত্তীর্ণা হইয়াছে দেখিয়া আমাদের আনন্দের আর সীমা নাই। শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রীগণও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

৪। হাইকোর্টের জাষ্টিস্ সরফুদ্দিন বঙ্গীয়মন্ত্রিসভার সদস্য নিযুক্ত হওয়াতে তাঁহার স্থানে হাইকোর্টের উকিল মৌলবী সামসুলহুদা জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৫। গত ১লা জুন কলিকাতা, কলেজ-স্কোয়ারের গোলদীঘিতে মহাত্মা ডেবিড হেয়ারের সমাধিস্তম্ভের নিকট তাঁহার মৃত্যুদিন স্মরণার্থ এক সভা হইয়াছিল।

৬। বহুকালের চেষ্টার পর উত্তর মেরু আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক্ষণে কাপ্তেন স্কট্ দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন।

৭। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের যত্নে, সুপ্রসিদ্ধ কবি কাশীরাম দাসের স্মৃতি রক্ষার্থ তাঁহার বাস্তুভিটা ইত্যাদি সংস্কারের জন্য অর্থসংগ্রহ হইতেছে।

৮। ১০৯ জন বঙ্গবাসিনী পরলোকগত সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যুশোকে মর্ম্মাহতা হইয়া লেডিমিণ্টো মহোদয়ার নিকট সমবেদনা প্রকাশ করিয়া টেলিগ্রাম করেন। উক্ত টেলিগ্রাম রাজমাতা আলেকজান্দ্রার নিকট পাঠান হয়, তিনি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

৯। নূতন রাজার রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য ভারতের অনেক কয়েদীর দণ্ডহ্রাসের অনুমতি হইয়াছে।

১০। বরোদার মহারাজ তাঁহার পত্নী ও কন্যাসহ জাপান যাত্রা করিয়াছেন।

সমালোচনা।

আমরা এস, পি, সেন মহাশয়ের নিকট হইতে এক শিশি 'সুষমা' কেশতৈল এবং ২শিশি যূথিকা এসেন্স পাইয়াছি। আমরা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, মস্তিষ্কশীতলতাসম্পাদনে উক্ত কেশতৈলটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এসেন্সটী বিলাতী সেণ্ট অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে।

বামারচনা।

ভারত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে অশ্রুনির্ঝর।

কুক্ষণে কি দুঃখবার্ত্তা প্রচারিল হায়!
দিক্ ব্যোম স্তব্ধ সব,
স্তব্ধ সে বিহগ-রব,
রুদ্ধ ফুল্ল ফুলগন্ধ, স্তব্ধ স্নিগ্ধ বায়,
স্তব্ধ হ'ল বসুন্ধরা সে শোক-বার্ত্তায়।
চকিতে চমকি প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া,
ভারত-সম্রাট্ নাই!
শূন্য মহাশূন্য তাই--
হইল ভারত-ভূমি চৌদিক্ ব্যাপিয়া
শোকেতে ভারত-প্রজা যাইল ডুবিয়া।
ভারতের ভাগ্যাকাশে ছিলা সে ভাস্কর,
ওরে কাল! কি করিলি,
কেন তাঁরে হরি নিলি,
করিয়া তমসাবৃত ভারত-অম্বর?
কি অসীম দুঃসাহস তোর রে তস্কর!
সূর্য্য নাহি অস্ত যান রাজ্যে কভু যাঁর,
কহিনুর সে রতন,
যাঁর শিরঃ-আভরণ,
হিমাচল-কিরীটিনী ভারত যাঁহার।
তাঁরে নিতে শঙ্কা নাই হ'ল দুরাচার?
কোথা বা ও ভারতের রাজ-রাজেশ্বর?

ভারতীয় রাজভক্ত

প্রজা তব অনুরক্ত,
কোটি কণ্ঠে আহ্বানিছে শুন পূজ্যবর!
তাদের যে রাজা—পিতা তুমি সর্ব্বেশ্বর।
প্রকৃতিবৎসল বীর সর্ব্বগুণাকর,
দয়াবান্, ক্ষমাবান্,
কর্ম্মবীর, মহাপ্রাণ,
ভারতহিতৈষী দেব রাজেন্দ্র প্রবর!
শান্তিপ্রিয় এড্‌ওয়ার্ড ইংলণ্ড-ঈশ্বর।
ধাতা বুঝি কর্ম্মক্লান্ত হেরিয়া তোমায়,
বিশ্রাম আরাম দিতে,
দূতে পাঠালেন নিতে;
যাও তবে যাও দেব! সেই অমরায়—
জরা-মৃত্যু-ব্যাধি-ক্লেশ নাহিক যথায়।
সুসজ্জিত আছে তথা রত্নসিংহাসন,
অপ্সর-কিন্নরবালা,
গলে দিয়া ফুলমালা,
অভ্যর্থনা করি তোমা লইতে রাজন!
দাঁড়ায়েছে স্বর্গদ্বার করি উন্মোচন।

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র।
(শোভাবাজার—রাজবাটী।)

নূতন।

বিভু!
একঘেয়ে কাজ আর ভাল নাহি লাগে,
সুবিস্তীর্ণ জগতের জীর্ণ প্রান্তভাগে।
শিখাও নূতন নাথ! করহে নূতন
দূর করে দাও যত চির পুরাতন।
মাধুর্য্য-মণ্ডিত তব ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে
কলঙ্কিত পুরাতন রহিবে কি করে,
করহ নূতন শোভা সাজাও নূতনে
নূতন আনন্দ দাও মানবের প্রাণে!
প্রভু, এ হৃদয়ে যত পুরাতন আশা—
ছিল সব ঘুচে গিয়ে হয়েছে নিরাশা;
উৎসাহ-আনন্দ হৃদে কিছু আর নাই,
নূতন আনন্দ কিছু তব কাছে চাই।
নূতন হৃদয়ে দাও নূতন উৎসাহ,
পুরাতন যাহা আজ সব ফিরে লহ।

শ্রীমতী সুরুচিবালা

স্বর্গীয় সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের বিয়োগে শোকোচ্ছ্বাস।

হায়! আজি কি শুনিনু একি হাহাকার!
ভারতের সর্ব্ব ঠাঁই,
কাঁদে সবে "রাজা নাই",
স্তব্ধ হিমাচল, স্তব্ধ বিশ্ব চরাচর।
হায়! একি সর্ব্বনাশ,
অকালে রাজার নাশ,
আমাদের রাজা নাই একি সমাচার!
তটিনী করুণ স্বরে,
শোকগীতি গান করে,
দীর্ঘশ্বাসে শোকোচ্ছ্বাসে পূরিত অম্বর।
উদাসিয়া মন প্রাণ,
হাহা-রবে হে পবন!

রাজার বিয়োগ গীতি কর কি প্রচার ?
হায় রে ! দারুণ শোকে,
গুমরি কাঁদিছে দুঃখে
ভারতের প্রজাবৃন্দ, অভাবে রাজার,
সুবিদ্বান্, দয়াবান্,
সর্ব্বগুণে গুণবান,
সুমাতার যোগ্য পুত্র, পুত্র বিধাতার।
শান্তিপ্রিয়, সুগম্ভীর,
ধর্ম্মপ্রাণ, কর্ম্মবীর,
হারাইয়া হেন রাজা, অভাগা প্রজার—
কি আছে উপায় আর,
বিনা শোক নেত্রাসার ?
কি আছে বুঝাতে হায় ! প্রাণ সবাকার ?
প্রজার স্মরিলে দুঃখ,
উথলিত যেই বুক
দয়া-সিন্ধু-নীরে, হায় ! কি দুঃখ প্রজার !
এ যে অতি অকস্মাৎ,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,
এডোয়ার্ডে হরি' নিল কাল দুরাচার।
শূন্য করি সিংহাসন,
আঁধারিয়া এ গগন,
হে রাজন ! কোথা গিয়ে উদিলে আবার ?
তোমারে পাইয়ে রাজা,
ভাগ্যবান্ তব প্রজা,
হেন রাজা হরিয়া কে লইল সবার ?
তোমার সদ্‌গুণরাশি,
স্মরিয়া ভারতবাসী
মর্ম্মভেদী শোকে হায় ! করে হাহাকার !
হে সম্রাট্ ! হে দেবতা !
তোমার সে গুণগাথা,
কে পারে বর্ণিতে হায় ! কি সাধ্য আমার ?
দেবোপম সুচরিত্র,
স্মরি তব, নিত্য নিত্য
পুজিবে ভারতবাসী, হৃদয়ে সবার।
রাখি কীর্ত্তি ধরাতলে,
গেলে এবে মার কোলে,
যাও তবে হে রাজন ! রয় হেথাকার।
আমরা ভারতবাসী,
স্মরি তব গুণরাশি,
চির দিন ঢালিব গো নয়ন-আসার।

শ্রীউষাবালা দেবী।
(পিরোজপুর)।

২১০ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 562. June, 1910.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৭ বর্ষ। ৫৬২ সংখ্যা। { জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। জুন, ১৯১০। } ৯ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শোক-সংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, বৈদ্যনাথ-দেবগৃহের পুণ্যশ্লোক মহাত্মা বরদাপ্রসাদ বসু রায় বাহাদুর হঠাৎ হৃদ্রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি গবর্ণমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদে প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া, প্রায় ২৫ বৎসর গত হইল, পেন্সন লইয়া, বহু আয়াস ও বহু ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক সুপ্রসিদ্ধ শব্দকল্পদ্রুম অভিধানের সুন্দর পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ নাগরাক্ষরে প্রকাশ করেন। অনন্তর আরো কয়েকখানি বড় বড় পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকাশ করেন এবং সেই বহুমূল্য বহুসংখ্যক পুস্তক পণ্ডিতগণকে বিনা মূল্যে বিতরণ করেন। অনন্তর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে দেখিয়া বৈদ্যনাথ দেবগৃহে অবস্থান করত তথায় ৩।৪ খানি বড় বড় বাটী নির্ম্মাণ করেন। তন্মধ্যে একখানি বাটীতে নিজে থাকিয়া অপর বাটীগুলি ভাড়া দিয়াছিলেন। নিজের বাটীর ভাড়া, পেন্সনের টাকা ও দেশের বিষয়ের আয় হইতে যৎসামান্য ব্যয়ে নিজ মুষ্টিমেয় অন্নের আয় চালাইয়া, সমস্ত অর্থই পরার্থে ব্যয় করিতেন। নিজ পৈতৃক মাজুগ্রামে বিদ্যালয় ছিল না। তিনি তথায় নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয় ও অতিথিশালা প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। বৈদ্যনাথ-কুষ্ঠাশ্রমে অর্থাভাবে অধিক কুষ্ঠী স্থান পায় না এবং যথোচিত পরিচর্য্যাদি হয় না। বহুদিনাবধি তিনি ঐ কুষ্ঠাশ্রমের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়া, স্বতঃ পরতঃ সর্ব্বপ্রযত্নে উহার নানা অভাব দূর করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি শোচনীয় কুষ্ঠিগণকে সন্তানাধিক স্নেহচক্ষে দেখিতেন। ঐ সকল স্থানে দুর্ভিক্ষ হইলে, তিনি নিত্য নিত্য বহু নিরন্ন ক্ষুধার্ত্তকে নানা ভক্ষ্য ও বস্ত্রাদি

দান করিতেন। দেশের কোনও বড় লোকের মৃত্যু হইলে বৈদ্যনাথ স্কুলগৃহে বা অন্যান্য প্রশস্ত স্থানে সভা করিয়া, উক্ত স্বর্গগত দেশহিতৈষী মহাত্মার জন্য যথোচিত শোক ও তৎপ্রতি গভীর ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার সদাই সহাস্য বদন, সুমধুর বচন ও হৃদয়ের গভীর ধর্ম্মভাব সকলকেই মুগ্ধ করিত। তিনি থিয়োসফি সম্প্রদায়ের ভক্ত ছিলেন। দিব্যশক্তি কর্ণেল অলকট ও লোকমহিতা, মহাপ্রভাবা দেবী আনি-বেশান্তের প্রতি তাঁহার গভীর ভক্তি ছিল। তিনি দেবগৃহে থাকায়, সকলেই পুণ্যশ্লোক ৺রাজনারায়ণ বসু মহোদয়ের বিয়োগ-শোক ভুলিয়াছিলেন। এক্ষণে তাদৃশ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের বিরহে দেবগৃহ আবার দেবশূন্য হইল।

তিনি উইল পত্র দ্বারা সমস্ত বিষয় সম্পত্তি পরার্থে দান করিয়া গিয়াছেন। কয়েক বৎসরাবধি পত্নীবিয়োগে তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। পরোপকারার্থে স্বয়ং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা করত শত শত দীন হীন রোগীকে ঔষধ ও পথ্য দান করিতেন। পরিচিত হউন, অপরিচিত হউন, কাহারও পীড়া বা কোনও বিপদের সংবাদ পাইলেই, অনাহূত স্বয়ং তথায় গিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার সাহায্য করিতেন। হায়! এদেশের কি দৌর্ভাগ্য! এদেশে "পরোপকারিণঃ সর্ব্বে প্রায়শঃ স্বল্পজীবিনঃ"—পরোপকারী মহাত্মারা প্রায় দীর্ঘজীবী হন না। তাঁহার বয়স ৬০ বর্ষের অধিক হয় নাই। তিনি সংসারে দীর্ঘজীবী না হইলেও, কৃতজ্ঞ লোক-হৃদয়ে অমর হইয়া থাকিবেন।

এবার মেট্রিকুলেসন পরীক্ষায় তিনটী ব্রাহ্ম বালিকা বৃত্তি পাইয়াছেন।

২০৲ টাকা বৃত্তি।

শ্রীমতী সুরীতি মিত্র লোরেটো।

১৫৲ টাকা বৃত্তি।

শ্রীমতী নলিনী সরকার ঐ।

১০৲ টাকা বৃত্তি।

শ্রীমতী শান্তা চাটার্জি বেথুন কলেজ।

রাজদর্শন—ইন্দোরের হোলকার, ভরতপুরের মহারাজ ও তাঁহার মাতা, কোচবিহারের মহারাজ ও নাভীর টিকা-সাহেব রাজা পঞ্চম জর্জ্জের দর্শন লাভ করিয়াছেন। ইন্দোরের রাণী, রাণী মেরির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

নূতন সদস্য—শুনা যাইতেছে যে, ভারতগবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিসভায় একজন নূতন সদস্য নিযুক্ত হইবেন, শিক্ষা ও স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধীয় সমস্ত ভার তাঁহার উপর থাকিবে।

রাজার স্মৃতি—ভূতপূর্ব্ব রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতিরক্ষার জন্য ভারতবর্ষের নানাস্থানে চেষ্টা হইতেছে। প্রত্যেক প্রদেশের রাজা স্মৃতিরক্ষার জন্য যাহা করিবেন, তদ্ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া রাজার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা দিল্লীতে স্থাপন করা হইবে।

বড়লাট—ডিউক অব্ কনট আমেরিকা

কানাডা রাজ্যের বড়লাট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, স্বর্গলোকগত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের ইচ্ছানুসারে তিনি নিয়োজিত।

সম্রাটের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় প্রার্থনা।

হে মৃত্যুঞ্জয় শিব! তুমিই কেবল মৃত্যুর অমোঘ বাণ হইতে জয়ী হইয়া আছ। সে তীক্ষ্ণ জ্বালা কেবল মানুষের দুর্ব্বল হৃদয় ভেদ করিয়া অহরহ নিয়তির চক্র পেষণ করিতেছে। আজ সেই অজেয় অঙ্কুশের আঘাতে আমাদের রাজরাজেশ্বরী ব্রিটিশ কুল লক্ষ্মীর কুসুম-কোমল হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি আজ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও সন্ন্যাসিনী। তাঁহার জীবনের চিরসহচর, ইহকালের ও পরকালের বন্ধু, ও পূজ্য, এবং অধীশ্বর, রাজাধিরাজ, স্বামী হইতে তিনি বিচ্ছিন্না হইয়াছেন। আর নাই আর নাই! সেই মহাসম্রাটের জীবনবায়ু ইতিপূর্ব্বেই ইহলোক হইতে অপসারিত হইয়া, সমগ্র রাজ্য শোক আঁধারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু দেহীর স্থূল দেহ এক পক্ষ পর্য্যন্ত, প্রিয়তমা পত্নীর ও প্রাণাধিক পুত্রকন্যার নয়নান্তরাল হয় নাই। তাঁহারা সেই সুন্দর, বিরাট পুরুষের আত্মাহীন দেহ, পুষ্পসম্ভারে সুসজ্জিত করিয়া পাষাণময় বিগ্রহের ন্যায় পূজা করিয়াছেন। কিন্তু হায়! আজ তাহারও শেষ।

হে দেবাদিদেব, মহাদেব! তোমার আদেশের উপর আর কার বিধান আছে? তুমি যে দিন ডাক, মানব আর তিলমাত্র এ সংসারে তিষ্ঠিতে পারে না। শত বন্ধন, অসীম ঐশ্বর্য্য ও পরম প্রীতিময়ী মমতা ছাড়াইয়া ছুটিতে হয়। তাই আজ মহানিদ্রামগ্ন সম্রাট্ এডওয়ার্ডের নশ্বর দেহের সমাধি তোমার চরণতলে ধরিত্রীর শীতল কক্ষায় আশ্রয় লইল, আর সেই পুণ্যময় আত্মার সুকল্যাণ হেতু ভারতের ত্রিশ কোটি নর-নারী বদ্ধকরযুগে আজ তোমার শ্রীপদ-পঙ্কজে গঙ্গাজলের সহিত অশ্রুজলের অর্ঘ্য দিতেছে।

হে বিশ্বের ঈশ্বর! সেই স্বর্গীয় আত্মার মঙ্গল করিয়া মোক্ষ প্রদান কর। তাঁহার পক্ষে আর ঈপ্সিত কিছুই নাই। সংসারের মহোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার সুখসমৃদ্ধি-ভোগের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। মানবজন্মে, ইহা অপেক্ষা রূপ গুণ কিছুরই আকাঙ্ক্ষা নাই। সেই নিরাকাঙ্ক্ষ, নিঃস্পৃহ দেবতা, মানব-মহারাজের জন্য কেবল পরম মোক্ষই বাঞ্ছনীয়। আর সেই পতিহীনা, অদ্বিতীয়া, রূপ-গুণ-সৌভাগ্যশালিনী মহিষীর শোকজর্জ্জরিত প্রাণে অধিষ্ঠিত হও। আজ তাঁহার সেই প্রাণসখার আসনে তুমি বিরাজিত থাকিয়া শোকাশ্রু

মুছাইয়া সান্ত্বনা দেও এবং এই মহাবিপদে, এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি অবিচল দয়া, মায়া এবং কর্ত্তব্যের টান জাগাইয়া রাখ। এই মহাসাম্রাজ্যের প্রজাপুঞ্জ আজি পিতৃহীন এবং বেদনায় ব্যথিত হইয়া ভাবি নরপতির মুখপানে চাহিয়া আছে। সন্তানের বেদনায় কে আর ব্যথিত হইবে? কাহার প্রাণে মমতাস্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া এই মহা ঝঞ্ঝাবাতে দুকুল শীতল করিবে? দীনশরণ! প্রেমরঞ্জন! দাঁড়াও এসে, এই শোক-তামস ভেদ করিয়া শান্তি-সূর্য্যরূপে আমাদের অসহায়, পিতৃহীন, নবীন নরপতির অন্তঃকরণে প্রকাশিত হও।

আমরা সুদূর জলধি পার হইতে আকুলহৃদয়ে নবরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জের জন্য কৃপাভিলাষী হইয়া উপস্থিত বিপদে বল ভিক্ষা করিতেছি।

এই জগৎ-সংসার যাঁহার আজ্ঞাধীন, যিনি এই শোক-দুঃখের নিয়ন্তা, সেই মহাবলশালী সম্রাটের চরণে ত্রিশ কোটি শির নত করিয়া গদগদ্ ভাবে ও ছল ছল নেত্রে সময়োচিত বন্দনায় পবিত্র সামগানের ন্যায় ভগবানের চরণে নিবেদন করিতেছি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীমনোজবারচয়িত্রী।

মহাপ্রস্থান।

বিদায়-দুন্দুভি শুন গম্ভীর স্বননে,
বাজিল ত্রিলোক ভেদি নিশি দ্বিপ্রহরে।
কম্পিত ব্রিটিশরাজ্য ভারতপ্রাঙ্গণ।
নিরাশার কালী-মাখা প্রত্যেক হৃদয়।
ঝরঝর অশ্রু ঝরে নীরব নিথর।
সপ্তম এডওয়ার্ড রাজ অধিরাজ,
অমর নগরে যায় জননীর ক্রোড়ে।
ত্যজি মর্ত্ত্য সিংহাসন সপ্ততি বরষে।
ধনৈশ্বর্য্য খ্যাতিবল সকলি বিলয়,
মৃত্যুর করাল বাণে, রাজ-চূড়ামণি
ধরিত্রী-শয়নে শান্তি লভিছে আরাম।
বিদ্রোহী কণ্টকে বাধা দিতে নারে সেথা।
কূটরাজনীতি চিন্তা সারা নিশিদিন—
ক্লান্ত ভ্রান্ত নাহি করে অন্তর পরাণ।
আনন্দ আনন্দময় সেই রম্য স্থান।
বিশ্রাম লভিতে গেলা এ নিদাঘকালে।
শচীসহ শচীপতি পরম আদরে,
দিল তারে রাজ্যপাট অমরনগরে।
শোকাকুলা ম্রিয়মাণা সমগ্র ভারত।
দশরথ গেলা স্বর্গে অযোধ্যা ত্যজিয়া,
রামরাজ্য পুত্রে সঁপি সমাহিতচিতে॥

শ্রীমনোজবারচয়িত্রী।

অরণ্যষষ্ঠী।

হিন্দুরমণীরা সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্ত অসাধ্য-সাধন ব্রতও করিতে পারেন। প্রাচীন কালের বঙ্গ-মহিলাগণের উপাখ্যান হইতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীনারা যতই ব্রত-নিয়ম ও উপবাসাদি করিতেন, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য পুত্র-কন্যার চির কল্যাণ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। তাঁহারা বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে যাহা করিতেন, দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া তদনুরূপ ফলও প্রদান করিয়া সেবিকার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন। বঙ্গসমাজে বারমাসে তের ষষ্ঠীর প্রচলন আছে এবং উহার প্রত্যেকটীর এক একটী উপাখ্যান আছে। সকল গুলিই পুত্রের মঙ্গলার্থে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে জ্যৈষ্ঠমাসের অরণ্য-ষষ্ঠী জামাতার অর্চ্চনার নিমিত্ত হইয়াছে। উহা কন্যার মাতার জামাতাকে আশীর্ব্বাদ দীর্ঘায়ু-কামনায়। কন্যার সুখ-সৌভাগ্য জামাতা হইতে; সেই জন্য ইহা, বঙ্গদেশে, জামাইষষ্ঠী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লষষ্ঠীতে এই ব্রত করিতে হয় ও সে দিন জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিবিধ উপচারে ভোজন করাইয়া বস্ত্র, মাল্য, গন্ধ, প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য জামাতার হস্তে শ্বশ্রূকে দিতে হয়। জামাতাও কৃতজ্ঞরূপে শ্বশ্রূকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ আদায় করিয়া লয়েন। গৃহিণীরা সে দিন সন্তানগণকে তৈল মাখিতে নিষেধ করেন। ব্রতকারিণী ব্রতের অন্তে অন্ন ভোজন করেন না; রুটি বা লুচির ফলাহার করিয়া ব্রত সমাপ্ত করেন। ইহার কথা নিম্নে লিখিত হইল।

এক থাকেন ব্রাহ্মণ, তাঁর এক ব্যাটা, এক বৌ। বৌয়ের ছেলে পুলে বাঁচে না; বৌটী দেবতা ব্রাহ্মণ কিছুই মানে না, দেবতাকে নিবেদন না করিয়া আগে আপনি খায়। এক দিন ব্রাহ্মণীর স্বপ্ন হোলো, "যে তোর বৌকে যদি ধরকাঠ করিস,তবে তোর বৌয়ের ছেলে বাঁচিবে"। স্বপ্ন দেখে জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠী হোলো, ব্রাহ্মণী সে দিন বৌকে বেঁধে রাখলেন, পাছে বৌ কিছু খেয়ে ফেলে। সকাল-বেলা বৌকে আঁচলা আঁচলি কোরে চুলোচুলি করে গঙ্গায় নাইয়ে নিয়ে এলেন। শাশুড়ি সব গোছাচ্চেন, বৌয়ের উদিকে জিব বেরিয়ে পড়েছে, তাই দেখে পাড়া-পড়সি বল্লে, "ও দিদি! তোমার বৌয়ের একি হোলো! জিব কেন বেরুলো! আট আঙ্গুল জিব রেখে বাকি কেটে দাও।" তাই শুনে শাশুড়ি জিব কেটে দিলেন। ব্রাহ্মণী পূজার উদ্যুগ করলেন, ছয়গাছা তূলোর কঙ্কণ হলুদ দিয়ে মাখ্‌লেন, তাতে মটর দই দিয়ে মা ষষ্ঠীর কাছে রাখ্‌লেন। কাঁচা সুতো বাটা হলুদ রাখলেন, সব ফল মূল দিয়ে ছটা ডালা সাজালেন, বটের

ডাল পুঁতলেন, আলপনা দিলেন, ধুপ-ধুনো, নৈবিত্তি সাজালেন, পিটুলির কাল বেরাল গ'ড়ে বটের পাতায় ষষ্ঠীতলায় শোয়ালেন। ব্রাহ্মণ তখন পূজা করিতে এলেন। বৌকে বল্লেন, ভক্তিভরে ঠাকুরকে পেন্নাম কর্, যে তোর কোলে ছেলে হয়ে বাঁচুক। গিন্নির স্বপ্ন হয়েছিল যে, আমি যে সব নিয়ম বলব তাই যদি বৌ করে, তবেই ছেলে বাঁচিবে. ছেলে বড় আব্দারে হবে, যে দিন কেউ মন্দ বল্‌বে তাহলেই ছেলে বাঁচবে না। অন্নপ্রাশনের সময় ছেলে খুব কাঁদ্‌বে, পিসির কাপড় নষ্ট করে দেবে, তাতে সে বিরক্ত হবে না। সকলে ষাট্ মানাবে "ষাট্ ষাট্ গোবিন্দের পুত" এই তিনবার বলবে। তখন যদি কেটে যায় পৈতের তবে ভারি দুরন্তপণা কর্‌বে, নাপিতের খুর ভেঙ্গে দেবে, ঢুলির ঢোল ভাঙ্গবে, তাতে তারা বাজার হবে না। তোম্‌রা সব দেবে. আর নাপিত, ঢুলি ষাট্ মানাবে, তখন সেবার বাঁচবে। ছেলে ডাগর হলে বিয়ে হবে, কনেকে গিয়ে শিখিয়ে আস্‌বে, যখন সাতপাক, তখন ছেলে একশত হাঁচি হাঁচবে আর কনে সেই সময় ষাট্ মানিয়ে বলবে, "ষাট ষাট ষাট, আমার এলেনির পুত, আমার শঙ্খ সিঁদুর" এই তিনবার বল্লেই রক্ষে পাবে।

জৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষে ষষ্ঠী, সেই দিন ছেলের মস্ত ফাঁড়া, তেল ছোঁবে না, মাখবে না, তবেই ত ছেলে বাঁচবে। মা-ষষ্ঠী স্বপ্নে দেখা দিয়ে এই সব নিয়ম বলে দিয়ে গেলেন। তার পর মা-ষষ্ঠীর কৃপায় বৌয়ের একটা ছেলে হোলো। এক মাস, ছমাস করে, ছেলে ছমাসের হোলো, অন্নপ্রাশন হবে, পিসিকে শিখিয়ে এলেন, "দেখ, যখন ছেলেকে কোলে নিয়ে বস্‌বি, ছেলে তোমার কাপড় ছিঁড়ে দেবে, তুমি তাতে রাগ কোরো না, তোমার যেমন কাপড় সেই রকম করে দেব"। ছেলের অন্নপ্রাশন হয়ে গেল। ছেলে পিসীর কাপড় ছিঁড়ে দিলে পিসী তাকে ষাট্ ষাট্ করে কোলে নিলেন, তাতে সে যাত্রা রক্ষা পেলো। ছেলে দিন দিন দুরন্ত হতে লাগ্‌লো, কেউ কিছু বলে না. এই রকম করে পৈতের সময় হোলো। পৈতে হবে গিন্নি নাপিত, ঢুলি সকলকে কেবল বল্‌ছেন, "দেখ! আমার নাতি তোমাদের যা কিছু নষ্ট করবে, তোমরা তাতে অসন্তুষ্ট হয়ো না, ছেলেকে মন্দ বোলো না, তোমাদের যত মূল্যের হোক্‌না সব আমি দেব"। এই ব'লে ক'য়ে ঠিক করে রাখলেন। কামাবার সময় নাপিতের খুর ভেঙ্গে দিলে, নাপিত ছেলেকে ষাট্ ষাট্ গোবিন্দের পুত বলে ষাট মানালে। নাপিতের খুর ঢুলির ঢোল, সব কিনে দিলেন। পৈতে হয়ে গেল, সেবারও রক্ষা হোলো। ছেলে বড় হোলো, বিয়ের সম্বন্ধ হ'তে লাগ্‌লো; দূরে কর্‌লে কেমন ক'রে হবে? যে, ছেলের ষাট্ মানাতে পারবে, নিকটে হবে, এমন জায়গায় ঠিক্ করলেন, আর কনেকে গিয়ে শিখিয়ে

এলেন যে, "বিয়ের সময় সাতপাকের সময় ছেলে একশ হাঁচি হাঁচবে, তখন তুমি ষাট্ ষাট্, আমার এলুনির পুত, শঙ্খসিঁদুর বলে তিনবার ষাট্ মানিও"। বিয়ে হোলো, কনে সেই রকম ক'রে ষাট্ মানালেন, সে যাত্রাও রক্ষা হোলো।

জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্ল পক্ষে অরণ্যষষ্ঠী। সে দিন ব্রাহ্মণ নগরে ঢোল পিটিয়ে দিলেন যে, সে দিন কেউ তেল বিক্রি না করে, তাদের যত বিক্রি ও লাভ হবে, তার বেশি তিনি দিবেন, কেউ যেন এক ফোঁটা তেল বার না করে।

নগরের দোকান পসার সব বন্ধ হোলো। ব্রাহ্মণী বৌকে আঁচলা আঁচলি করে নাইয়ে নিয়ে এলেন। বাড়িতে যেখানে যেখানে তেল ছিল, সমস্তই লুকিয়ে ফেল-লেন। তার পর মা-ষষ্ঠীর পূজো করতে বসলেন। এমন সময় ছেলে নগর ঘুরে বেলা ছপুরের সময় এসে বল্লে, "দে তেল, নেয়ে আসি।" উদিকে মা ষষ্ঠীর ডাক পড়েছে ছেলে আর থাক্‌তে পারছে না, কেবল বলছে, 'মা তেল দে'। মা বল্লেন, "বাছা! আজ ষষ্ঠী, তেল মাখ্‌তে নেই, অমনি নেয়ে এস"। ছেলে কোন মতে না শুনে, যেখানে ছাই কুণ্ডে একখানা তেলের ভাঙ্গা খোল পড়েছিল, তাই নিয়ে যেমন মাথা ঘসেছে অমনি টলে পড়লো। মা-ষষ্ঠী তাড়াতাড়ি কোলে নিয়ে আপনার কাছে রাখ্‌লেন। অমনি ব্রাহ্মণী ও তার বৌ কান্নাকাটি করতে লাগলেন। তখন মা-ষষ্ঠী আবার স্বপ্ন দিলেন, "কাঁদিস্‌নে। ষষ্ঠীর কথা বল, পূজো কর, তোর ভাল হবে"। তখন ব্রাহ্মণী ষষ্ঠীর কথা বল্লেন, বট গাছের সঙ্গে স্থতো বাঁধলেন, সেই স্থতো ধরে কথা শুন্‌লেন, তুলোর কঙ্কণ গাছে পরিয়ে দিলেন। তাই দেখে মা-ষষ্ঠী বল্লেন, "আমার ভক্ত আমাকে কঙ্কণ দিয়েছে, পরি" এই ব'লে পরলেন। নূতন শাঁখার কাছে কঙ্কণ কেমন শোভা পাচ্চে, বৌয়ের কোল শূন্য হয়েছে, তার কোলে ছেলে দেই ও যেমন আমার হাতের শোভা করেছে, আমি ওর কোলের তেমনি শোভা করে দি"। এই বলে যতগুলি ছেলে মারা গিয়েছিল, (ছয়টী) ছেলে দিলেন, আর আশীর্ব্বাদ করলেন, দেবতা বামনের আগ্ খেয়োনা, ধর্ম্মে মতি দিও"। সেই অবধি মর্ত্ত্যে এই কথা প্রচার হোলো। বুড়ো বুড়ি স্বর্গে গেলেন, ছেলে-বৌ সংসার করতে লাগ্‌লেন। যে শোনে, যে কয়, তার এমনি হয়।

পূজো করে উ'ঠে সকল ছেলেদের হাতে কাঁচা স্থতো বেঁধে দিলেন, পাখার বাতাস দিলেন। ডালায় ছটা ফল, এক আটি দূর্ব্বা (১২৬), ছটা ধানের শীষ থাকে।

একখানা তালপাখার উপরে দূর্ব্বার আটি, ধানের শীষ, একটা আম রেখে একটা বড় পাত্রে জল রাখিয়া সেই দূর্ব্বা দিয়া জল মাথায় ছকুড়ি ছবার দিতে হয়। পুনরায় সেইরূপে ১২৬টী দূর্ব্বা একটী একটী করিয়া, তেত্রিশকোটি দেবতার নাম করিয়া প্রথমে ষাট্ মানাইতে হয়

অর্থাৎ যেমন যাট্‌, ষাট্‌, ষাট্‌ বিশ্বেশ্বরের ষাট্‌, পরে পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর, ননদ ও আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির সন্তানের জন্য ষাট্‌ মানাইতে হয়। অবশেষে নিজের সন্তানের ষাট্‌ মানাইয়া সেই পাখা দ্বারা ছেলেদের গায়ে বাতাস দিতে হয়।

ইহা হইতে দেখা যায়, পূর্ব্বে দেবীরাও সহজেই প্রসন্না হইয়া সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন, কিন্তু এখন আর তাহা দেখা যায় না। প্রাচীনাদের মত ভক্তি ও বিশ্বাসের অভাবেই বোধ করি এখন সেরূপ হয় না।

শ্রীশশিমুখী দেবী।

শিশুদিগের খাদ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

সকল ঔষধালয়েই সাইট্রেট্‌ অব্‌ সোডা (Citrate of Soda) পাওয়া যায় এবং মূল্যও অল্প। ইহা খানিকটা কিনিয়া রাখিয়া প্রতিবার দুধ খাইবার পূর্ব্বে তিন বা চারি গ্রেন এক তোলা শীতল জলে গুলিয়া শিশুকে খাওয়াইলে, শিশু দুগ্ধ সহজে পরিপাক করিতে পারে। সকলেই জানেন, দুগ্ধ পাকাশয়ে উপস্থিত হইলেই জমাট (Clot) বাঁধিয়া যায়। সাইট্রেট্‌ অব সোডা খাওয়াইলে এই জমাট দুগ্ধ শীঘ্র হজম হয়; ইহা শিশুকে খাওয়াইতে কোন কষ্ট নাই, ইহা বিস্বাদ নহে। যদি ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধ উপস্থিত হয়, তবে পূর্ব্বোল্লিখিত মত দুগ্ধের সহিত টাটকা মাখন ও দুগ্ধ-শর্করা মিশাইয়া খাওয়াইলেই সব গোল মিটিয়া যায়।

কলিকাতা প্রভৃতি সহরে বিশুদ্ধ গাভী-দুগ্ধ পাওয়া সুকঠিন। গোয়ালাদের দুধে এত অধিক জল থাকে যে, তাহাতে শিশুদের সম্যক্‌ পুষ্টিসাধন হয় না। যদি এই জলমিশ্রিত দুধ অনেকক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে, জলীয় ভাগ কমে, সন্দেহ নাই, কিন্তু শিশুদের অনুপযোগী হয়; এই দুধ শিশুরা শীঘ্র হজম করিতে পারে না। আবার সহরের অধিকাংশ গৃহস্থই বেলা নয়টা বা দশটা বেলার পূর্ব্বে দুধ পান না। সুতরাং শিশুকে প্রাতঃকালের তিন চারি ঘণ্টা টিনের বিলাতী দুধ (Condensed milk) গরম জলে গুলিয়া খাওয়ান হয়। কন্‌ডেন্স মিল্ক ও গোয়ালার জলমিশ্রিত দুধ খাইয়া, শিশু পুষ্টিকর আহার অভাবে শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

সাধারণতঃ দুগ্ধ-ব্যবসায়ীরা পল্লীগ্রাম হইতে দুধ আনিয়া সহরে যোগায় এবং পল্লীগ্রামের পচা পুকুরের জল মিশাইয়া

আনে। ইহাতে অনেক প্রকার রোগবীজ থাকে এবং শিশুদের উদরাময় উপস্থিত করে। তবে আমাদের দেশে দুগ্ধ অন্ততঃ এক বলকা না হইলে কেহই শিশুকে খাওয়ান না, এই জন্য ততটা কুফল দৃষ্ট হয় না। দুগ্ধ সিদ্ধ করিলেই অধিকাংশ রোগবীজ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অনেকে দুগ্ধ সিদ্ধ করার পর দুগ্ধ-পাত্রটীর উপর কোনওরূপ ঢাকা না দিয়াই রন্ধন-গৃহে বসাইয়া রাখেন এবং প্রয়োজন মত উহা হইতে দুগ্ধ লইয়া শিশুকে খাওয়ান। মাছি এবং রন্ধনগৃহের রুদ্ধ ও স্থলবিশেষে দূষিত বায়ু দ্বারা অনেক অনিষ্টকর রোগ-বীজ দুগ্ধে সংক্রামিত হইয়া শিশুদের উদরাময় প্রভৃতি উৎপন্ন করে।

অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, গোয়ালা গাভী-দুধের সহিত মহিষের দুধ ও প্রচুর পরিমাণ জল মিশাইয়া নির্জ্জল গাভী দুধ বলিয়া চড়া দরে বিক্রয় করে। এই দুধ দেখিলে এমন কি দুধপরীক্ষার যন্ত্র (Lactometer) দ্বারা পরীক্ষা করিলেও জল ধরা পড়ে না। ফলতঃ শিশুদিগকে "খাঁটী দুধ" খাওয়াইলাম মনে করিয়া এই দুধ খাওয়াইলে প্রায়ই শিশুদের উদরাময় ও শীর্ণতা উপস্থিত হয়।

বাজারে নানা নামের নানা প্রকার পেটেন্ট "শিশুদের খাদ্য" (Infant's Food) বিক্রয় হইয়া থাকে। এই সকল "শিশুদের খাদ্যে"র প্রস্তুতকারকদের জমকাল বিজ্ঞাপন দেখিয়া অনেকে "খাঁটী দুধের" অভাবে শিশুদিগকে ইহার একটা না একটা খাওয়ান। এই সকল খাদ্যের অনেকগুলিই পুষ্টিকারক ও সুপথ্য। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, দোকানে অনেক দিন অবিক্রীত থাকায় অথবা সেঁতো, ঠাণ্ডা বা উত্তপ্ত স্থানে রাখায় বা শিশুর মাতা উত্তমরূপ আবৃত করিয়া না রাখায় এই সকল "খাদ্য" উৎপচিত (fermented) কিম্বা অন্য প্রকারে বিকৃত হইয়া থাকে। শিশুকে এই বিকৃত খাদ্য খাওয়াইলে শিশুর উদরাময় উৎপন্ন হয়।

যাঁহারা শিশুকে ফিডিং বোতল (Feeding bottle) দ্বারা গাভীদুগ্ধ খাওয়ান, তাঁহাদের বিশেষভাবে জানিয়া রাখা উচিত. যে, বোতলটী খুব পরিষ্কৃত করা চাই। শিশু দুগ্ধ পান করিবার পরই বোতলটীর ভিতর একটু সোডা বা লবণ ও গরম জল প্রবেশ করাইয়া খুব ঝাঁকি দিয়া ধুইয়া বোতলটাকে জলে ডুবাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। যেখানে জলের কল আছে, সেখানে বোতল পরিষ্কার করা খুব সুবিধা; বোতলটীর একটী মুখ কলের নলে লাগাইয়া জোরে জল ছাড়িয়া দিলেই অন্য মুখ দিয়া জল বহির্গত হইয়া যায় এবং বোতলের ভিতরটী উত্তমরূপ পরিষ্কার হয়। শিশুকে দুগ্ধ খাওয়াইবার সময় আর একবার বোতলটী গরম জলে ধুইয়া তবে তাহাতে দুগ্ধ প্রবেশ করান কর্ত্তব্য। কেবল বোতলটী ধুইলেই চলিবে না টিট্ (teat) অর্থাৎ স্তনের বোঁটার মত রবারটীকে উল্টাইয়া ভাল করিয়া ধুইয়া বোতলের সহিত জলে

ডুবাইয়া রাখা কর্ত্তব্য এবং শিশুকে দুগ্ধ খাওয়াইবার সময় আর একবার ধুইয়া লওয়া উচিত। এই প্রকার সাবধান না হইয়া যদি কেবল সামান্য একটু শীতল জলে ধুইয়া বোতলটী যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে বোতলের ভিতর যে দুগ্ধ লাগিয়া থাকে, তাহা বায়ুস্থিত জীবাণুসংস্পর্শে উৎপচিত হইয়া যায় এবং মাছি বসায় নানারূপ বিষ বোতলে সংক্রামিত হয়। যদি বোতল গরম জলে না ধুইয়া উহাতে দুধ ঢালিয়া শিশুকে পান করান হয়, তাহা হইলে, ঐ উৎপচিত দুগ্ধকণা ও রোগবীজ শিশুর উদরস্থ হইয়া উদরাময় এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রাণান্তকর ব্যাধির সৃষ্টি করে।

পুণ্যজীবনের প্রচ্ছন্ন চিত্র।

বসু মহাশয়ের বিশাল কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তৃত বিবরণী, তাঁহার জীবনব্যাপী আত্মলোপের সযত্ন-প্রয়াসরূপ গূঢ় আবরণে এরূপ অভেদ্য ভাবে লুক্কায়িত ছিল যে, ৩৮ বৎসরব্যাপী যুগল জীবনপ্রবাহ এক পথে প্রবাহিত করিয়াও আমি তাঁহার সমস্ত কার্য্যাবলী অল্পই আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি। কর্ম্মশালার মহাব্যস্ততা মধ্যে, নিশিদিন জীবনের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য উৎসর্গ করিয়া ভগবানের আজ্ঞাবহ দাসের বিনম্রভাব ভিন্ন সে মহান্, বিমল, পূতজীবনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন, তাঁহারামাত্র এ বাক্যের সত্যতা গভীরভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। বাহির হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাঁহার আর একটী স্বর্গের প্রতিভা ও সৌরভপূর্ণ মহোচ্চ অংশ বিকাশ পাইয়া স্বর্গের আলোক, উৎসাহ, বিশুদ্ধতার শুভ্রালোক অনুক্ষণ বিকীর্ণ করিত; সাধারণ জীবন হইতে এই স্থলেই তাহার বিশেষত্ব। ঘটনাবলীর অনিবার্য্য সংঘর্ষণে কচিৎ কথনও সেই বিশেষত্ব যখন প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তখনমাত্র বাহির হইতে সাধারণে তাঁহার দুর্লভ ঐশীশক্তিপূর্ণ প্রকৃতির কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। জীবন-ব্যাপী কঠোরতম সংযম ও সাধনাবলে, লোক-চক্ষুর অন্তরালে, আপনাকে নিয়ত প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ভগবানের মঙ্গলময়ী শক্তির মহা-প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া, বহু যত্নে ও বহু প্রয়াসে তিনি দুর্লভ মানবজীবনের যে একটী নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছিলেন, প্রাতমুহূর্ত্তে তিল তিল করিয়া ঐ আলেখ্যের সম্মুখে মহাযোগে নিমগ্ন থাকিয়া নিজ ও পরিবার এবং সন্তানগণের জীবন ঠিক ঐ আদর্শে গঠন করিতে অসীম, অক্লান্ত

যত্ন ও ধৈর্য্যসহকারে প্রয়াস পাইতেন। ভগবানের দুর্লভ বরে তিনি অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু কোনও কার্য্যে তাঁহার জন্য এক বিন্দু উচ্চতা, গর্ব্ব, কি "অহম্" ভাব কদাপি প্রকাশ পায় নাই। "সাধনা সিদ্ধির মূল," ইহাই অক্ষম, সক্ষম, সকলের জীবনের মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণের অনুরোধ করিতেন। এই সম্বন্ধে আমার সহিত তাঁহার সর্ব্বদাই তর্ক চলিত। আমি হিন্দুপ্রথামতে বাল্যকালে বিবাহিতা। প্রথম জীবনে শিক্ষার সুযোগ যখন ঘটে নাই, তখন এ জীবন ত সাধারণ শত সহস্র নর-নারীর মত, সংসারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীমধ্যেই অলক্ষিতভাবে ধ্বংস হইবে,—এই সংস্কার আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়াতে, আমার জীবন তাঁহার মত মহোচ্চ লোকের সঙ্গে পরিচালনা অসম্ভব মনে করিতাম, এবং সর্ব্বদাই তাঁহাকে বলিতাম, "তুমি এত উন্নত, শিক্ষিত হইয়াও কয় ঘণ্টার আলাপে এমন নগণ্যা অল্পবয়স্কা বালিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে কি করিয়া সম্মত হইলে?" তাহা ভাবিতে পারি না। তখন কলিকাতায়, আচার্য্য কেশব চন্দ্র সেনের প্রতিষ্ঠিত স্ত্রীশিক্ষালয়ে শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী সেন, কুমারী রাধারাণী ও অন্নদায়িনীরমত সুশিক্ষিতা, চরিত্রবতী মহিলাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইয়া নিজের হীনতার তুলনায় নিশিদিন অতীব অনুশোচনায় কাটিত। শাশুড়ী ঠাকুরাণী দেশ হইতে আত্মীয়-দাস-দাসী-পূর্ণ একটী প্রকাণ্ড দল লইয়া বসু মহাশয়ের বিলাতযাত্রায় বাধা দিবার জন্য ১৮৬৯ সনের ডিসেম্বর মাসে আগমন করিলেন। তখন বহুবাজার ২২ নং ঠাকুর দাস পালিতের লেনে তাঁহার বাসস্থান ছিল। এই সনের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাহ্মধর্ম্মের কঠিন পুস্তকাদি ও তৎকালের উচ্চ শিক্ষা ও "বামাবোধিনী" সভার অন্তর্গত ৫ম বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষা দানের অত্যন্ত দুরূহ পুস্তক এবং স্ত্রীজাতির যে নূতন পরিচ্ছদ ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত ছিল, তাহা পরিবারস্থ মহিলাদিগের মধ্যে প্রচলিত করিবার জন্য আমাকে সঙ্গে লইয়া পৈতৃক বাটী জয়সিদ্ধি গমন করিলেন। বাটীতে দেশের বধূদের মত আমি যেন কদাচ না থাকি, সমস্ত পথ কেবল এই পরামর্শ চলিল। তখনই স্বর্গীয় কুমুদিনীচরিত পাঠ করিতে দিলেন। বিবাহের সময় ৫টী দিন জয়সিদ্ধির বাটীতে মহাভয়ত্রাসে কাটিয়াছিল। এত বৎসরেও তাহা ভুলি নাই; সুতরাং বসু মহাশয়ের পরামর্শে চলিলে কি তাড়না—অশান্তি চলিবে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি অটল পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিত থাকিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, "ব্রহ্মকৃপায় সকলি সম্ভব হয়"।

"গুরু কল্পতরু সকলি সম্ভবে তোমারি নামে" এই গানটা আমি ভক্তিভাজন ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল মহাশয়ের নিকট শিখিয়াছিলাম, তাহা হৃদয়ের ভক্তির সহিত সুদীর্ঘ পথে গাহিয়া মনকে

সবল করার প্রয়াস পাইতাম। সঙ্গে দীননাথ নামে দেশের ভৃত্য ও কলিকাতার এক নূতন ঝি ছিল, তাহারাও অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া এই সঙ্গীতে যোগ দিত। ক্রমে জয়সিদ্ধির নিকটবর্ত্তী কয়খানা গ্রামের সম্মুখবর্ত্তী হওয়ামাত্রই দীননাথ সভয়ে নৌকার জানালাগুলি পরদাবৃত করিয়া বলিল, "বউঠাকরুণ! এখন ঠিক্ বড়-বৌঠাকরুণের মত না চলিলে বড় অখ্যাতি হইবে। এই সকল গ্রাম আমাদেরই জমীদারীভুক্ত। প্রজারা সকলে বিবাহের পর দাদাকে অভ্যর্থনার জন্য আসিতেছে"। ইহা শুনিয়া আমার বালিকা-হৃদয়ে, যে উৎকট ভয়ের উদ্রেক হইল, তাহা অবর্ণনীয়। কারণ, বিবাহের পর যে ৫ দিন জয়সিদ্ধির বাটীতে বাস করিয়াছিলাম, তখন আমার হাতে "শঙ্খ", নাকে নত, কাণে প্রকাণ্ড ঢেড়ী-ঝুমকা ও মুখে উল্কি নাই বলিয়া প্রতিবাসিনী দাস-দাসীরা আমার পিতৃগৃহের সকলের উদ্দেশ্যে এমন ভাষা দিবানিশি আমার সম্বন্ধে প্রয়োগ করিত, যে, আমায় উল্কিভূষিতা ও কাণ-নাক বিদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াও সদাশয়, পরম-স্নেহশীল ভাসুর হরমোহন বসু মহাশয়ের শাসনের ভয়ে কৃতকার্য্য হইবে না, তাহা তাহারা মনে জানিল। আমি বিহ্বল হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিলাম। দীননাথ গম্ভীর-ভাবে দেশের চাল-চলন সম্বন্ধে আমায় দীর্ঘ উপদেশ দিতে লাগিল। দলে দলে আয়তস্ত্রী এবং পুরুষে নৌকা পূর্ণ হইল। সিন্দূরাদি যথেষ্ট লেপনাদির কোনই ত্রুটি হয় নাই। আমার পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ দেখিয়া ঝিও যথেষ্ট তিরস্কৃতা হইল। বসু মহাশয় হঠাৎ অবশিষ্ট পরিচ্ছদগুলি হস্তে লইয়া মেয়েদিগকে বলিলেন, "দেখ ত। এ কাপড় লজ্জাশীলতা রক্ষার্থে কত ভাল। তোমরা লইয়া যাও, পরিও"। বলা বাহুল্য তাঁহার এই ব্যবহারে সকলে কত দূর বিস্মিত হইয়া প্রস্থান করিল। যথাসময়ে বাড়ী পঁহুছিলাম। রাত্রিভোজনের পর ভাসুর মহাশয়, শ্বশ্রূদেবী এবং বসু মহাশয় আমার সম্মুখে শয়নের দালানের চৌকীতে বসিয়া নানা গল্পাদি আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে করিতে-ছেন, হঠাৎ বসু মহাশয় জননীর পদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন, "মা! আপনি শপথ করিয়া বলুন, আমার একটা ইচ্ছা সন্তুষ্টচিত্তে পূর্ণ করিতে দিবেন, তাহা এই যে,—আমি দীর্ঘকালের জন্য বিলাতে বিদ্যাশিক্ষার্থী ভাবে গমন করিব ঠিক্ করিয়া, আপনার অনুমতিভিক্ষার জন্য আসিলাম। আমি বাড়ী হইতে টাকা লইতে আসি নাই। কেবল আপনার অনুমতি গ্রহণার্থে আসিয়াছি"। এই আকস্মিক বজ্রপাততুল্য সংবাদে বিধবা জননীর যে বিষম অবস্থা ঘটিল, তাহা অবর্ণনীয়। বিধবা জননী এই সুদীর্ঘ কাল হৃদয়ে অপুত আশা পোষণপূর্ব্বক, মনের অপূর্ব্ব দৃঢ়তা প্রদর্শন পূর্ব্বক দীর্ঘকাল কলিকাতার ন্যায় দূর-বর্ত্তী স্থানেও পুত্রকে শিক্ষার জন্য রাখিয়া-ছিলেন। ছুটীর মধ্যে পাছে এক দিনও কলেজে অনুপস্থিতি ঘটে, এই ভয়ে ৪।৫ দিন হাতে থাকিতে থাকিতে পুত্রদ্বয়কে

যাত্রাদি করাইয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে বিদায় দিতেন। সেই ত্যাগস্বীকারের পরিণাম এই—"স্লেচ্ছ" হওয়া!!! সেই হৃদয়ভেদী ক্রন্দনের রোল, অভিশাপ এবং আমার পিতৃবংশের কুপরামর্শের এই ফল তাহাও শুনিলাম। ভাসুর মহাশয় অসীম বাৎসল্য সহ আমায় সান্ত্বনা দিতে দিতে তাঁহার ভ্রাতার উপযুক্ত পত্নী হইতে আমায় উপদেশ দিলেন। অনেক উৎকৃষ্ট পুস্তকপূর্ণ আলমারীর চাবি আমায় দিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিলেন ৫।৬দিন অবিশ্রান্ত অশান্তি ভোগের পর সকলে কলিকাতার সুন্দরবনের পথে রওনা হইয়া ১৮দিনের পর কলিকাতা পঁহুছি। বাড়ীতে সমারোহে দুর্গাপূজার ভোজনাদি চলিয়াছে। ভ্রাতা তাহাতে যোগ না দিয়া দালানে দরজা বন্ধপূর্ব্বক আমায় লইয়া উপাসনাসঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। শাশুড়ী ঠাকুরাণী প্রতিমা প্রণাম জন্য বড় বউ ও আমায় লইয়া যাইতেন। আমি দাঁড়াইয়া থাকিতাম মাত্র।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ পুরাণবক্তা (কথক) মদীয় ৺পিতৃদেব কৃষ্ণমোহন শিরোমণির কথা। (১)

এদেশে মুমূর্ষু বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে গঙ্গাযাত্রা করান হয়। অনেক মুমূর্ষু গঙ্গাতটে নীত হইয়া, অধিক দিন বাস করিয়া গতায়ু হন। সে সময় মুমূর্ষুকে হরিকথা ও হরিনামসংকীর্ত্তন শুনান হইত। এখনও অনেক স্থানে হইয়া থাকে। কিন্তু কেহ কেহ গঙ্গাতটে ঐরূপ কথকতা করাকে ঘৃণিত বা অসম্মানকর মনে করেন। আমার পিতা সেরূপ মনে করিতেন না। বরং উহাকে বিশেষ পুণ্যকর্ম্ম জ্ঞান করিতেন। তিনি বলিতেন,—ঐ স্থলে কথকতা করিয়া দান গ্রহণ করাই নিষিদ্ধ। ওরূপ স্থলে একটী কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতে নাই। সম্পূর্ণ নিষ্কাম ও সাত্ত্বিকভাবে মুমূর্ষুর হৃদয়ে ভগবৎকথামৃত সেচন করা যদি অপকর্ম্ম হয়, তবে সৎকর্ম্ম কাহাকে বলে? কত মুমূর্ষু তাঁহার মুখে ভগবৎকথা শুনিতে শুনিতে ভগবৎপ্রেমানন্দে সংসারমায়া ও মৃত্যুযাতনা বিস্মৃত হইয়া, পুলকিত হৃদয়ে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

ধরিতে গেলে, এই কথকতার প্রথম সৃষ্টি গঙ্গাতটে মুমূর্ষুর স্থানেই হইয়াছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে সপ্তাহমধ্যেই

(১) ইনি অনেক স্থানে 'কৃষ্ণহরি কথক' নামে বিখ্যাত। প্রকৃত নাম কৃষ্ণমোহন। প্রায় ৪০ বৎসর স্বর্গত।

তক্ষকদংশনে (১) প্রাণত্যাগ করিবেন, এজন্য তিনি রাজভবন ত্যাগ করিয়া পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তটে সুরক্ষিত ভবনে বাস করিলেন। তাঁহার অনুতপ্ত, শোকজ্বলিত প্রাণে শান্তিসুধা সেচন করিবার জন্য, তথায় অকস্মাৎ এক অপূর্ব্ব নবীন যুবার আবির্ভাব হইল। তিনি জীবন্মুক্ত, উলঙ্গদেহ, সর্ব্বত্যাগী, জ্ঞান-পীযূষসাগর,আত্মারাম, নির্দ্বন্দ্ব, নির্ব্বিকার, বিশ্বপ্রেমের অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তি! যৌবনে পদার্পণ করিলেও, সুকোমল শিশু-সৌকুমার্য্য তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিভাত। সেই লাবণ্যময়, নগ্নকায়,হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ, অপূর্ব্ব তরুণমূর্ত্তি পথ দিয়া চলিয়া আসিতেছেন, সুধানিস্যন্দিনী তদীয় দেহপ্রভা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া, সে সকল স্থানকে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নাময় করিতেছে। তাঁহার চৌদিকে জল, বায়ু, আকাশ, মৃত্তিকা, তরুলতা, চরাচর সকলি মধুময় হইতেছে। হিংস্র-পশুরাও অবাক্-নিস্পন্দ হইয়া সে অপরূপ রূপমাধুরী দর্শন করিতেছে। এক স্থানে তাঁহার সম্মুখস্থ জলাশয়ে কুলাঙ্গনারা, (সে স্থান নির্জ্জন বলিয়া) বিশ্রব্ধভাবে পরিধেয় উন্মোচনপূর্ব্বক নগ্নদেহে স্নান করিতেছিলেন, সেই উলঙ্গ তরুণমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, কেহই বিন্দুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ না করিয়া, সতৃষ্ণনেত্রে সে রূপমাধুরী দর্শন করিতে লাগিলেন। বালযোগী শুকদেবের সে শান্তিনির্ঝর, পতিতপাবন দৃষ্টিপাতে দংশনোদ্যত কাল-সর্পকেও সমুন্নত ফণাচক্র সঙ্কুচিত করিতে হয়। নির্ব্বিকার, জীবন্মুক্ত ব্রহ্মযোগীর প্রভাব এইরূপ।

সে সময় মহারাজ পরীক্ষিতের সে ভবনে সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইলেও, ঋষি-তপস্বি-ব্রাহ্মণ-সাধুর প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় নাই। সেই বিবিক্ত গঙ্গাতটে পরীক্ষিতের ভবনদ্বারে শুকদেব উপস্থিত হইবামাত্র, সকলে সসম্ভ্রমে আসিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। স্বয়ং মহারাজ ঋষি-মণ্ডলীসহ দ্বারে আসিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়া অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। অনন্তর, ব্রহ্মশাপানলে জ্বলিতহৃদয়, আসন্নমৃত্যু, ধর্ম্মপ্রাণ পরীক্ষিৎকে অক্ষয়, আনন্দময়, অনপায়িনী শান্তির আধার নবজীবন দান করিবার জন্য, বালযোগী শুকদেবের বদনসুধাকর হইতে অপূর্ব্ব ভাগবতামৃত ক্ষরিত হইতে লাগিল। রাজা সে অমৃত ঢোকে ঢোকে পান করিতে লাগিলেন। তাঁহার পাপ তাপ চিন্তা গ্লানি মৃত্যুভয়, অরুণোদয়ে তামসরাশির ন্যায় অদৃশ্য হইল। তখন তিনি ব্রহ্মসমাহিত, ব্রহ্মময় ব্রহ্মানন্দে পূর্ণাত্মা। তখন তিনি রোগ-শোক-মৃত্যুময় সংসার হইতে বহু ঊর্দ্ধে। তখন তিনি যমদণ্ডের অগ্রাহ্য। তক্ষক কাহাকে দংশন করিবে? তিনি কেবল ব্রহ্মবাক্য রক্ষার জন্য ভৌতিক দেহমাত্র তক্ষককে দিয়া, সচ্চিদানন্দধামে প্রস্থান করিলেন। এই ভাগবত,—"নিগমকল্প-

(১) 'তক্ষক'—ভীষণ কালসর্প। লোকে সচরাচর যাহাকে তক্ষক বলে, এ তক্ষক তাহা নহে।

তরোর্গলিতং ফলম্।”—সত্যই ইহা বেদরূপ কল্পবৃক্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিণত ফল, শুকদেবরূপ শুকপক্ষীর মুখ হইতে, এ মরজগৎকে অমরতা দিবার জন্যই, ভূলোকে পতিত হইয়াছে। যাঁহারা ভগবৎ-প্রেমরসে রসিক, তাঁহারা এ রস অনন্ত কাল পান করুন। যতবার ইহা পান করিবেন, প্রতিবারেই নব-নব নব রস-মাধুরী সম্ভোগ করিবেন।

অতএব দেখা যাইতেছে,—মুমূর্ষুর প্রাণে শান্তিসুধাদানের জন্যই ভাগবত-কথার সৃষ্টি। নিঃস্বার্থভাবে ভগবৎকথা শুনাইয়া, গঙ্গাতটশায়ী মুমূর্ষুর আত্মার শান্তিদান করাকে, আমার দয়াসাগর পিতৃদেব কদাচ হেয়কার্য্য জ্ঞান করিতেন না। বিনা দক্ষিণায় যজ্ঞ পূর্ণ হয় না, এই যুক্তি ধরিয়া, সে স্থলে মুমূর্ষু যদি তাঁহাকে দক্ষিণাদানার্থ নিরতিশয় নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতেন, তবে পিতা তাঁহার মনঃক্ষোভ নিবারণার্থ তাঁহার হস্ত হইতে একটী হরীতকীমাত্র গ্রহণ করিয়া, তাহা নারায়ণের উদ্দেশে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিতেন।

আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতি, পূজ্যপাদ লক্ষ্মীনারায়ণ (১) ঠাকুরদাদা নবতি বর্ষ বয়সে মুমূর্ষুকালে গঙ্গাতটে নীত হন। আমার বয়স তখন চারি বর্ষ। আমার বাল্যস্মৃতি প্রবল বলিয়াই সে কথা স্বপ্নবৎ মনে হয়। "দয়া করি দাও হরি! দরশন" ইত্যাদি কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে সকলে তাঁহাকে আমাদের বাটীর পার্শ্ব দিয়া গঙ্গাতটে লইয়া যাইতেছেন। আমার পিতা ও পিতৃব্যেরা সকলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে চলিলেন। তিনি গঙ্গাতটে প্রায় এক সপ্তাহ জীবিত ছিলেন। তথায় তখন তাঁহার কি ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—আর আমার কোনও ইচ্ছা নাই। কেবল, (আমার পিতার নাম করিয়া) উঁহার মুখে ভাগবতকথা শুনিতেই ইচ্ছা হয়। পিতৃদেবও পরমানন্দে প্রত্যহ বৈকাল হইতে রাত্রি চারি পাঁচ দণ্ড পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরম যত্নে ভাগবত শুনাইতে লাগিলেন। তখন সে শ্মশানঘাট অপূর্ব্ব আনন্দ-কাননে পরিণত হইল। তথায় লোকে লোকারণ্য। এস্থলে একটী ঘটনা বলা আবশ্যক। উক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের দুই পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশান-চন্দ্র তৎকালে পরলোকগত। কনিষ্ঠ হরচন্দ্র তখন বর্ত্তমান। হরচন্দ্র দ্বারকা-নাথ বিদ্যাভূষণের পিতা। হরচন্দ্র কলিকাতা-গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালাপাঠশালার প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি জ্ঞানী ও পরোপকারী হইয়াও, স্ত্রৈণতা দোষে পিতার বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। তদীয় পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহার সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, তাঁহার অপর পুত্র ঈশান-চন্দ্রের বাটীতে থাকিতেন। লক্ষ্মীনারায়ণ হরচন্দ্রকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছিলেন।

(১) ইনি সুবিখ্যাত সোমপ্রকাশসম্পাদক ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের পিতামহ এবং সুপণ্ডিত ৺হরনাথ ন্যায়রত্নের পিতা।

অধিক কি, তিনি সে পুত্রের বা পুত্রবধূর কোনও দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না ও তাঁহাদের মুখদর্শন করিতেন না। লক্ষ্মীনারায়ণ অতি তেজস্বী ও কোপনস্বভাব ছিলেন। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। গঙ্গাযাত্রাকালেও উক্ত পুত্র বা পুত্রবধূকে কাছে আসিতে দেন নাই। পিতার মৃত্যুকালেও তাঁহার কাছে যাইতে না পারায়, হরচন্দ্র অনুতাপে ও লজ্জায় মৃতকল্প হইলেন। এ ঘটনা আমার পিতার প্রাণে শেলসম বাজিল। অনন্তর শেষ দিন কথকতার অবসানে তাঁহার গঙ্গালাভের আর বিলম্ব নাই বুঝিয়া, আমার পিতা তাঁহার পদতলে পড়িয়া, অতীব কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—জ্যেঠামহাশয়! শ্রীচরণে আমার একটী ভিক্ষা আছে। যদি তাহা দিতে অঙ্গীকার করেন, তবে এ সময় নিবেদন করি। লক্ষ্মীনারায়ণ বলিলেন,—বাবা! তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। কিন্তু এ সময় কি দিতে পারি? শীঘ্র বল! আমার সময় হইয়াছে. আর বিলম্ব নাই, বলিয়া নিজেই নিজের নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবে না। তখন অপরাহ্ণ বেলা। তখন আমার পিতা তাঁহার পদতলে পড়িয়া, বাষ্পাকুলনেত্রে গদগদকণ্ঠে কহিলেন,—পিতঃ! আপনার জ্যেষ্ঠ সন্তান হরচন্দ্র দাদাকে ক্ষমা করুন, এ সময় উহাঁর সকল অপরাধ বিস্মৃত হইয়া, উহাঁকে কাছে ডাকুন। আর আপনি যে আমাকে বলিয়াছিলেন,—"উহাঁর হস্তের জলপিণ্ড আমার অগ্রাহ্য। তুমিই আমার যথার্থ সন্তানের কার্য্য চিরদিন করিয়াছ. অতএব তুমিই আমার মুখাগ্নি ও শ্রাদ্ধাদি সমস্তই করিও।" সে দেবাজ্ঞা আমি অবশ্যই পালন করিব। কিন্তু হরচন্দ্র দাদারও জলপিণ্ড আপনি গ্রহণ করিবেন এবং উহাঁকে ক্ষমা করিলেন, বলুন!—এইমাত্র আমার ভিক্ষা। তখন লক্ষ্মীনারায়ণ একটু মৌনভাবে থাকিয়া বলিলেন,—দান বিনা যজ্ঞ পূর্ণ হয় না—("হতো যজ্ঞস্বদক্ষিণঃ")। তুমি ত কোনও দান গ্রহণ করিবে না। অতএব. হরচন্দ্রের জন্য যে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছ, তাহা আমি এ সময় নির্ম্মলচিত্তে দিলাম। সে সময় হরচন্দ্র জ্যেঠামহাশয় বাবার পশ্চাতেই ছিলেন। বাবার ইঙ্গিতমাত্র তিনি সম্মুখে আসিয়া রোদন করিতে করিতে পিতৃপদে নিপতিত হইলেন। তদীয় পিতা অস্থিমে নির্ম্মলচিত্তে পুত্রকে ক্ষমা করিলেন। এই ঘটনার পরক্ষণেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

স্বকীয় যোগ্যতায় ও ভগবৎকৃপায় আমার পিতৃপিতামহের বিদ্যা, ধন ও বৃহৎ বৃহৎ ক্রিয়াকাণ্ডজনিত সর্ব্বত্র খ্যাতি-প্রতিপত্তি দর্শনে, আমাদের কতিপয় জ্ঞাতির ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে না পারিয়া, পরোক্ষে আমাদের নানা অনিষ্ট চেষ্টা করিতেন। আমার পিতা ও পিতামহ উভয়েরই জ্ঞাতিপ্রেম অলৌকিক। ব্রাহ্মণজাতিমধ্যে দাক্ষিণাত্য বৈদিকশ্রেণী সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র। অধিকাংশই সামান্য যজন যাজনাদি দ্বারা এবং শিষ্য-

সেবকের সাহায্যে প্রতিপালিত হইতেন। আমরা শৈশবে আমাদের অঞ্চলে দুই চারি জনের অধিক চাকুরে বৈদিক দেখি নাই। এজন্য "ফলারে বৈদিক," "ভিখারী বৈদিক" প্রবাদ। কিন্তু দেখি, বৈদিকই ধরা পড়িয়াছেন। ফলার পাইলে যে কে আনন্দিত না হন,তাহা জানি না। দেখিতে পাই, রাশি রাশি মিষ্টান্ন দেবতাকে নিবেদন করা হয়। এজন্য মনে হয়, দেবলোক অধিক লোভী। অথবা তাঁদের তুল্য লোভী জগতে বুঝি কেহই নাই। কেননা, তাঁহারা রামকামারের ধন শ্যামকামারকে দিয়া, হত্যাকারীর ফাঁসি নিরপরাধের কণ্ঠে লাগাইয়া, উৎকোচস্বরূপ পাঁঠা ও রাশি রাশি মিষ্টান্ন গ্রহণ করেন। আমি একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বলিতে শুনিয়াছি—"যদি এ জাল মামলায় জয়লাভ করি, তবে,মা কালি! তোমাকে জোড়া পাঁঠা ও সোণার বিল্বপত্রে পূজা দিব।" যখন দেবলোকের এই দশা, তখন দুর্ব্বলচিত্ত মনুষ্যের অপরাধ কি?

দরিদ্র বৈদিকশ্রেণীর মধ্যে, স্বপৌরুষে কেহ ধনবান্ ও ক্রিয়াবান্ হইলে, তদীয় জ্ঞাতি-কুটুম্বগণের তাহা অসহ্য, এজন্য আমার পিতৃপিতামহের কতিপয় অন্তঃশত্রু ছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ প্রকাশ্যভাবেই অনিষ্টাচরণ করিতেন। পিতৃপিতামহেরা ঠিক্ তাহার বিপরীত ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদের জীবনের ইহাই মূলমন্ত্র ছিল,—

"পাপেঽপ্যপাপঃ পরুষেঽপ্যভিধত্তে প্রিয়াণি যঃ।
মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণস্তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা॥"
(বিষ্ণুপুরাণ।)

যে ঘোর শত্রুর প্রতি নিষ্পাপহৃদয়,
কঠোরভাষীকে কয় বাক্য মধুময়,
বিশ্বপ্রেমে দ্রবীভূত যাহার হৃদয়—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডমাঝে সঞ্চারিত হয়,
সে কেন মোক্ষের তরে করিবে সাধন?
তাহার হস্তেই সেই পরমার্থ ধন।

এইরূপ ঘটনা শতবার ঘটিয়াছে—ঐরূপ পরমশত্রু জ্ঞাতিকুটুম্ব দায়গ্রস্ত বা বিপন্ন হইয়া বাটীতে আসিলে, আমার পিতৃপিতামহ সর্ব্বস্বদানেও কাতর হন নাই। হাতে টাকা না থাকিলেও, পরিবারবর্গের গাত্রালঙ্কার বন্ধক দিয়া তাঁহাদের দায় মোচন করিতেন। এই কার্য্যে তাঁহারা কোনও বাধা মানিতেন না। বলিতেন, বিপন্নের বিপদ্ মোচন করাই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, সে সময় আর কোনও দিক্ দেখিতে নাই।

এইরূপে আমার মাতৃদেবীর সমস্ত অলঙ্কার নিঃশেষ হইয়াছিল, অঙ্গে শাঁকা ও লোহামাত্র অবশেষ ছিল। সে জন্য মাকে কখনও দুঃখ করিতে শুনি নাই। তিনি বলিতেন,—"আমার সীমন্তে এই সিন্দুরই আমার সাত রাজার ধন, অমূল্য মাণিক। একদা আমাদের কোনও ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি অথচ ঘোর শত্রু আসিয়া অন্নাভাব জানাইলে, পিতা তদীয় দুঃখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করত, ভাণ্ডার হইতে বস্তা বস্তা তণ্ডুলাদি বাহির করিয়া, ভৃত্য দ্বারা তাঁহার বাটীতে পাঠাইতে লাগিলেন।

ইহাতে আমার পিতামহী বিরক্তি প্রকাশ করায়, পিতা বলিলেন,—মা! যে তোমার যত অনিষ্টচেষ্টা করিবে, তাহার বিপদে তত সাহায্য করিও। জানিও মা! এ জগতে কেহ কাহারও অনিষ্ট করিতে পারে না। যে পরের অনিষ্টচেষ্টা করে, সে নিজেরি অমঙ্গল ঘটায়। যাহার উপর যত ক্রোধ হইবে, তাহাকে তত অধিক দান করিবে।

আমার পিতামহী মহাপ্রভবা ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে আমার বীরকেশরী পিতামহকেও ভীত হইতে হইত। একদা পিতামহের মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রায় এক-পক্ষব্যাপী বিপুল ভোজব্যাপারের পর, বাটীর পরিবারবর্গ, ভৃত্যবর্গ এবং প্রতি-বেশিনী পাচিকা আত্মীয়ারা, সকলেই অতি-শ্রমে আক্রান্ত ও উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়াছে। ইত্যবসরে বৈকালে আমাদের বাটীর পার্শ্ব দিয়া, মৎস্যবিক্রেতারা চারি পাঁচ ভার উৎকৃষ্ট মৎস্য লইয়া রাজপুরবাজারে বিক্রয় করিতে যাইতে-ছিল। দেখিয়াই তাহাতে পিতামহের সলোভদৃষ্টি পতিত হইল। তিনি পার্শ্বস্থ বন্ধুগণকে বলিলেন,—ভাই! আজি রাত্রিতে এ মৎস্য আমার জ্ঞাতিকুটুম্বগণকে না খাওয়ালে আমার আহার-নিদ্রা হইবে না। বলিয়াই তৎক্ষণাৎ সমস্ত মৎস্য ক্রয় করিয়া বাটীর মধ্যে পাঠাইলেন। ব্যাপার বুঝিয়া আমার পিতামহী অতি-মাত্র রোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেননা, সেই বৃহৎ মাতৃশ্রাদ্ধব্যাপারের পর বাটীর বা পল্লীর কাহারও আর উত্থানশক্তি ছিল না। পিতামহীর রোষ দেখিলে, পিতামহ দ্বিরুক্তি করিতেন না, আস্তে আস্তে বহির্বাটীতে আসিতেন। বলিতেন, ক্ষেপী বক্র হইলেই আমার সর্ব্বনাশ। আমার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বিনষ্ট হইবে।

পিতামহীর ক্রোধ দেখিয়া, পিতামহ আমার পিতা ও পিতৃব্য প্রভৃতিকে আদেশ করিলেন,—শীঘ্র এই মৎস্য ভাগ করিয়া, কয় গ্রামের সমস্ত জ্ঞাতিকুটুম্বের বাটীতে পাঠাও, এবং প্রত্যেক বাটীতে যথোচিত পরিমাণে কাঁচা তরকারি, চাউল, ডাউল, ঘৃত, তৈল, লবণ, মসলা, কাষ্ঠ প্রভৃতি ও মিষ্টান্নাদি পাঠাও, এবং সকলকে বলিয়া আইস যে, আজি হইতে এ বাটীতে জ্ঞাতিকুটুম্বের পাত পাড়িয়া ভোজন উঠিয়া গেল। সত্য সত্যই তাঁহার সে আদেশ পালিত হয় দেখিয়া, পিতামহী তখন পল্লীর সমস্ত পাচিকা প্রভৃতিকে ডাকিয়া পাক আরম্ভ করিলেন। তৎ-ক্ষণাৎ রাজপুরবাজার ও অন্যান্য স্থান হইতে ক্ষীর, দধি, মিষ্টান্নাদি ভারে ভারে আনীত হইল। রাত্রি ১১টার মধ্যেই পাঁচ ছয় শত ব্রাহ্মণের ভোজন সম্পন্ন হইল।

পিতামহ কলিকাতা হইতে বাটী আসিবার সময়, রাজপুরের প্রান্ত হইতে যথাক্রমে সমস্ত গ্রামের প্রায় সমস্ত জ্ঞাতি-কুটুম্বাদির বাটীর সংবাদ লইতেন। হয়ত কার্য্যানুরোধে কোনও বাটীতে দুই এক

দিন বাস করিতেন। যথায় তাঁহার পদার্পণ হইত, তথায় বহু লোকের সমাগম হইত। সমাজের কোন্ ব্যক্তির পিতামাতাদির শ্রাদ্ধ কোন্ দিন হইবে, সে সংবাদ তিনি রাখিতেন। একদা তিনি কলিকাতা হইতে বাটী আসিবার সময় রাজপুরের কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ সসম্ভ্রমে আসিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। পিতামহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—আজি না তোমার পিতৃশ্রাদ্ধ? কোনও উদ্যোগ দেখিতেছি না কেন? ব্রাহ্মণ কাতরভাবে বলিলেন,—আমি অতি দরিদ্র, উদরান্নের সংস্থান নাই। আমি কিরূপে লোকজন খাওয়াইব? যথাসময়ে কিঞ্চিৎ তিলতণ্ডুলে পিণ্ডদানমাত্র করিব। পিতামহ তৎক্ষণাৎ প্রতিবেশিগণকে ডাকাইয়া উক্ত শ্রাদ্ধে বিপুল ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজন করিলেন। তাঁহার আদেশমাত্র কয় গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইলেন। তিনি নিজ বাটীর পুষ্করিণী হইতে বহু মৎস্য ও নিজ উদ্যান হইতে কদলীপত্রাদি আনাইলেন। তাঁহার আজ্ঞায় অবিলম্বে নানা স্থান হইতে ভারে ভারে দধিমিষ্টান্নাদি ও অন্যান্য উপকরণসম্ভার প্রচুর পরিমাণে আহৃত হইল। পাকাদিকার্য্যের জন্য আমার পিতামহী, মা ও পিসিমা প্রভৃতি তথায় আগমন করিলেন। এইরূপে সেই দরিদ্রভবনে কয়েক দিন বহুলোকের ভোজন ও আনন্দোৎসবের স্রোত বহিল। বিনা ক্রিয়াকর্ম্মে, বিনা আনন্দোৎসবে তিনি একটী দিনও থাকিতে পারিতেন না। যথায় উৎসবের কোনও সূত্রই নাই, তথায় তিনি লূতার ন্যায় উৎসবরূপ তন্তুজালের সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে পরমানন্দে বিহার করিতেন।

আমাদের সংসারের সে সত্যযুগের অনেক বিষয়ের প্রত্যক্ষসাক্ষিণী আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরা অদ্যাপি জীবিত আছেন। তাঁহার বয়স এখন প্রায় ৭৪ বর্ষ হইবে। ইদানীং তাঁহার দেহ এককালে ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার শ্রবণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হওয়ায়, পূর্ব্বকথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা ও তদুত্তর লাভ করা বড়ই কষ্টসাধ্য। তথাপি এই গ্রন্থ-প্রণয়নকালে তাঁহার নিকট অনেক পূর্ব্বকথা জ্ঞাত হইতেছি। চতুর্দ্দশভুবনবৃত্তান্ত যাঁহার করতলামলকবৎ প্রত্যক্ষ ছিল, সেই পুরাণেতিহাসের অতুল আধারস্বরূপ, অদ্বিতীয় শ্রুতিধর ও স্মৃতিসম্পন্ন মহাপুরুষের পুত্র, আমি নিজ পিতৃলোকেরও কৃতিকীর্ত্তি-বিবরণে অনভিজ্ঞ, ইহা অপেক্ষা এ অধম সন্তানের দৌর্ভাগ্যের কথা কি আছে?

একদা বারাশত, মজিলপুর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি গ্রামের প্রায় একশত ব্রাহ্মণ রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় হঠাৎ আমাদের বাটীতে আগমন করিলেন। তাঁহারা কলিকাতার সন্নিহিত ইটালির বিখ্যাত ক্রিয়াবান্ ধনী দেবনারায়ণ দেব মহাশয়ের বাটীতে ক্রিয়া উপলক্ষ্যে আসিয়াছিলেন। তথায় দিবাভাগে জলপান করিয়া, বিদায় লইয়া, পদব্রজে গৃহাভি-

মুখে যাত্রা করেন। কলিকাতা হইতে মজিলপুর প্রায় ষোল ক্রোশ দূরে। গ্রীষ্মকালের আতপে ও পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া, তাঁহারা রাজপুর বাজারে আসিয়া তত্রত্য গঙ্গাতটে বিশ্রামপূর্ব্বক সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিলেন। তাঁহারা এরূপ ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে, সে রাত্রিতে তথা হইতে প্রায় দশ ক্রোশ দূরে মজিলপুরে যাওয়া অসাধ্য বিবেচনা করিলেন। অনন্তর সকলে আমাদের বাটীতে আগমন করিলেন। তৎকালে দস্যুভয়ে রাত্রিকালে আমাদের সদর দ্বার প্রভৃতি দৃঢ়বদ্ধ থাকিত। ৫।৬ টা দ্বার পার হইয়া তবে আমাদের দ্বিতলে পৌঁছিতে হইত। তাঁহারা সদর দ্বারে আসিয়া সকলে সমবেত স্বরে বিকট চিৎকার করায়, বাটীর সকলে, ডাকাত পড়িল, ভাবিয়া ভয়ে থর-থর কাঁপিতে লাগিলেন। কিন্তু পিতামহ বলিলেন, এরূপ স্বর দস্যুর নহে। আচ্ছা, দেখিতেছি, বলিয়া, তিনি মসাল হস্তে একে একে সমস্ত দ্বার খুলিয়া, সদর দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং নিঃশব্দে দ্বাররন্ধ্র দিয়া নিপুণভাবে দেখিলেন। ঠিক্ সেই সময়, আগন্তুকেরা সমবেত স্বরে হরিধ্বনি করিলেন। তিনি পরিচিত কণ্ঠস্বরে আশ্বস্ত হইয়া, দ্বার খুলিলেন, এবং পরমাত্মীয় কুটুম্বমণ্ডলী দেখিয়া, পরমানন্দে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে সদর বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে বসাইলেন। পিতামহ দলপতি বলিয়া, বাটীতে নিত্যই বহুলোকের সমাগম ও ভোজনাদি হইত। এজন্য, সর্ব্বদাই চণ্ডীমণ্ডপ ও আটচালা সতরঞ্চ ও গালিচা প্রভৃতি আস্তরণে মণ্ডিত থাকিত। ভূরি ভূরি লোকের তামাকু, পাদোদক ও গাত্রমার্জ্জনাদি প্রস্তুত থাকিত। দিবারাত্র সকলের অভ্যর্থনা ও পরিচর্য্যাদির জন্য ৩।৪ জন ভৃত্য উপস্থিত থাকিত। পিতামহ সকলকে ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত দেখিয়া, সকলের পাদপ্রক্ষালনাদি করাইয়া, প্রথমে প্রত্যেককে এক এক পাত্র সুশীতল শর্করাসলিল ও এক একটী সন্দেশ জল খাওয়াইলেন। তাঁহাদের আগমনমাত্রেই তিনি আমার পিতামহীকে বলিয়াছিলেন, এখনি একশত ব্রাহ্মণের অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে হইবে। আমাদের আজি সৌভাগ্য! আজ আরাধ্য কুটুম্বগণের এ স্থানে পদধূলি পড়িয়াছে। তৎক্ষণাৎ মা, পিসিমা প্রভৃতি এককালে ৭।৮টা চুল্লীতে অন্ন ও দ্বিদলাদি চড়াইলেন। এদিকে আমার মধ্যম পিতৃব্য পুকুরে জাল নামাইয়া অবিলম্বে বহু মৎস্য ধরাইলেন। আমাদের পুকুরপাড়ে কয়েক ঘর কৈবর্ত্তরমণী ছিল। তাহারা আমাদের বাটীর ক্রিয়াকর্ম্মে দেহপাত করিত এবং আমাদের দ্বারা প্রতিপালিত হইত। তাহারা আসিয়া কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই সমস্ত মাছ, তরকারি, বাটনা প্রভৃতি রন্ধনার্থ প্রস্তুত করিয়া দিল। দেড় ঘণ্টা মধ্যে, ঠিক্ ইন্দ্রজালের ন্যায়, একশত লোকের উপযোগী নানা উপাদেয় অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইল। অন্দরের বৃহৎ দালানে দুই পংক্তিতে সারি সারি আসন ও স্থালীপূর্ণ

সুরভি উষ্ণ অন্ন (১) ও বিবিধ উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন পরিপাটীরূপে সজ্জিত হইল। অভ্যাগতেরা বহির্বাটীতে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, অহো! তর্কপঞ্চাননের আশ্চর্য্য সংসার! এরূপ পল্লীগ্রামে এ নিশীথকালে ক্ষণমাত্রে এত লোকের এরূপ জলযোগ ও শয্যাদি দান করা সহজ ব্যাপার নহে। ইত্যবসরে আমার পিতৃব্য গিয়া বলিলেন, কৃপা করিয়া আপনারা গাত্রোত্থান করুন। আপনাদের জন্ত যৎসামান্ত অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত। এ গ্রীষ্মে দিবাভাগে সামান্ত জলপান করিয়া এতদূর পদব্রজে আসিয়াছেন। এক্ষণে ছুটী অন্ন ভোজন না করিলে, আপনাদের কষ্ট হইবে এবং গৃহস্থের দারুণ মনঃকষ্ট হইবে (২)। তাঁহার কথায় প্রথমে কেহই বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন, তুমি কি বলিতেছ? এত রাত্রে এত শীঘ্র এতগুলি লোকের অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করা কি সম্ভব? ইত্যবসরে পিতামহ গিয়া ভোজনার্থ আহ্বান করায়, সকলে উঠিয়া বাটীর মধ্যে গিয়া দেখিলেন, সত্যই সমস্ত প্রস্তুত। প্রত্যেক পাত্রে সুরভি, উষ্ণ অন্ন ও ব্যঞ্জনপূর্ণ আধারসকল পরিপাটীরূপে সজ্জিত। তাঁহারা আসনে পদার্পণ করিয়াই উল্লাসে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভোজন করিয়া এত তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন যে, তাহা যাবজ্জীবন ভুলিতে পারেন নাই। পিতামহ তাঁহাদিগকে তিন চারি দিন ছাড়েন নাই। সে রাত্রিতে মনোমত পরিচর্য্যা হইল না বলিয়া, জিদ করিয়া সকলকে কয়েক দিন রাখিয়া নিত্য নিত্য নব নব ভক্ষ্য-ভোজ্যে সকলকে তৃপ্ত করিতে লাগিলেন। বাটীতে আমোদ-প্রমোদের স্রোত বহিতে লাগিল। তাঁহারা প্রস্থানকালে, তর্কপঞ্চাননের ভাণ্ডারগৃহ দর্শন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

---

(১) আমাদের পৈতৃক ব্রহ্মত্র জমিতে এক প্রকার অপূর্ব্ব, সুরভি, শুভ্র ধান্ত উৎপন্ন হইত। উহার তণ্ডুলকে সকলে "রাঁধুনি পাগল" বলিত। রন্ধনকালে উহার সৌরভে রাঁধুনি লোকে উন্মত্ত হয়, এই অর্থে ঐ নামকরণ। গৃহে নবান্নবাসরে ঐ তণ্ডুলে বর্ষে বর্ষে বহু জ্ঞাতিকুটুম্বাদির সমারোহে ভোজ হইত।

(২) তৎকালে প্রায় সকলেই দুই বেলা অন্ন ভোজন করিতেন। যাঁহারা বিধবা ও ব্রহ্মচারী, তাঁহারাই একাহারী ছিলেন। অগ্নিমান্দ্য, অম্লরোগ, শিশুযকৃৎ, বহুমূত্রাদি রোগ, অজীর্ণতা, তরুণীগণের নানা বায়ুরোগ, মূর্চ্ছারোগ, ধাতুঘটিত নানা পীড়া, এ সকল সদাচারলজ্ঘনের অলজ্ঘ্য বিষময় ফল তৎকালে অজ্ঞাত ছিল। প্রবল

পাশ্চাত্য জাতির সম্বন্ধে আমরা উক্ত উন্নতিশীল জাতির প্রকৃত মহত্ত্বের অনুসরণ করিতে না পারিয়া সাধারণতঃ যাহা কিছু অনুকরণ করিতেছি, তাহার অনেকগুলি এদেশের পক্ষে অনিষ্টকর।

ইর্ষার বন্দিনী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

তৎপর দিন কিঞ্চিৎ বেলা হইলে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। যখন আমি শয্যাত্যাগ করিলাম, তখন ডাণ্টলী-ভবনস্থিত ঘটিকায় ৮টা বাজিতে শুনিলাম। লর্ড ডাণ্টলীর মাতৃস্বসা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রতিদিন নয়টার সময় প্রাতর্ভোজন সমাধা করিয়া থাকেন, এবং আমি যদি সঙ্কোচ বোধ না করি, তবে তাঁহাদের সহিত আমি প্রত্যহ একত্র ভোজন করিতে পারি। লর্ড ডাণ্টলীর মাতৃস্বসার কথানুসারে আমি শীঘ্র শীঘ্র বেশভূষা সমাধা করিলাম, এবং নয়টা বাজিবামাত্র ভোজনাগারে উপস্থিত হইবার জন্য নিম্নে অবতরণ করিলাম। যখন আমি ভোজনাগারে উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম যে, ভোজনাগারে তখনও কেহ উপস্থিত হয়েন নাই। কিন্তু প্রকাণ্ড মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত টেবিলের উপর খাদ্যপূর্ণ অসংখ্য পাত্র সজ্জিত রহিয়াছে। সেই অপূর্ব্ব খাদ্যদ্রব্যের সুগন্ধে গৃহ আমোদিত হইতেছে। গৃহে কেহ উপস্থিত নাই ভাবিয়া আমি সেই মহার্ঘ্য আসবাবসজ্জিত গৃহের চতুর্দ্দিকে বিস্মিতনয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। গৃহ তখন উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে হাসিতেছিল এবং বাহিরের প্রকাণ্ড সুন্দর পুষ্পোদ্যান হইতে বসন্তকালের ন্যায় মৃদু মন্দ বায়ু গৃহমধ্যে মনোহর পুষ্পগন্ধ বহিয়া আনিতেছিল। আমি বাতায়নের মধ্য দিয়া বাহিরের সূর্য্যকরোজ্জ্বলিত পুষ্পোদ্যানে দৃষ্টিপাত করিতে যাইয়া দেখিলাম যে, গৃহ সম্পূর্ণ শূন্য নহে, বাতায়নসন্নিধানে কে একজন দণ্ডায়মান হইয়া নীরবে বাহিরের পুষ্পোদ্যানের শোভা দর্শন করিতেছেন। তাঁহার ভদ্রোচিত পরিচ্ছদে বুঝিলাম যে, তিনি ডাণ্টলী ক্যাসলের ভৃত্যবর্গের মধ্যে কেহ নহেন। হয়ত তাঁহার দর্শনে সহসা আমার মুখ হইতে কোন বিস্ময়সূচক শব্দ বহির্গত হইয়াছিল। কেননা, পরক্ষণেই তাঁহাকে চমকিত হইয়া পশ্চাৎদিকে ফিরিতে দেখিলাম। তিনি ফিরিতেই দেখিলাম যে, তিনি একটী দীর্ঘাকৃতি যুবাপুরুষ। তাঁহার দীর্ঘ সুনীল নয়নদ্বয় ও উন্নত ললাটদেশ তাঁহাকে সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূত বলিয়া সূচিত করিতেছিল। কিন্তু তাঁহার বর্ণ ইটালিয়ানগণের ন্যায় সম্পূর্ণ শ্যাম। যুবক, বোধ হয়, সেই গৃহমধ্যে আমার ন্যায় একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত রমণীর উপস্থিতিতে অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিয়াছিলেন। কেননা, তিনি ক্ষণকাল আমার প্রতি বিস্মিতনেত্রে

চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু আত্মসম্বরণপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—

মিস্ রেমণ্ড! আপনাকে দেখিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। আপনাকে প্রাত রভিবাদন করিতেছি।

আমি প্রত্যাভিবাদন করিলে, তিনি আমার সহিত হস্তবিকম্পন করিয়া মৃদু-হাসিয়া বলিলেন—

এক্ষণে বাটীস্থ কেহ ভোজনার্থ উপস্থিত হয়েন নাই। তবে আসুন, আমরা উভয়ে প্রাতরুত্থানকারী পক্ষীর ন্যায় সমস্ত কীটরাশি অগ্রেই উদরস্থ করি।

এই সময়ে ভোজনগৃহের বাহিরে কথোপকথন এবং হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল, এবং পরক্ষণেই প্রায় পঁচিশ ত্রিশ জন পুরুষ ও রমণীতে গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল। সকলে ভোজন টেবিলের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলে আমিও উপবেশন করিলাম। ভোজনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সেই ভোজনার্থিগণের মধ্য হইতে একজন যুবতী ভোজনপাত্র সকল উদ্ঘাটনপূর্ব্বক খাদ্যসামগ্রী সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই যুবতীর ন্যায় সুন্দরী রমণী আমি পূর্ব্বে কখনও দর্শন করি নাই। তুষারশুভ্র উন্নত-গ্রীবা সমন্বিত দেহ, দীর্ঘ সুনীল নয়ন এবং প্রস্ফুটিত লোহিত গোলাপসদৃশ ওষ্ঠাধরে রমণী অতুলনীয় সুন্দরী। কিন্তু এই অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের মধ্যে কিসের যেন অভাব দৃষ্ট হইতেছিল। এই যুবতীর মুখে এবং নয়নে একটা নীচতাসূচক ভাব ব্যক্ত হইতেছিল। বোধ হয় এই নীচতাসূচক ভাবই তাঁহার পূর্ণ সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটী অপূর্ণতার অভাব সৃষ্টি করিয়াছিল।

তৎপরে ভোজনে নিযুক্ত হইয়া সকলে নানাবিধ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলকে হাস্য, আমোদ ও ভোজনে প্রবৃত্ত দেখিয়া আমি সেই অবসরে সেই ভোজন-টেবিলের পুরুষ ও রমনীগণকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। সেই পুরুষ ও রমনীগণের মধ্যে যুবক অপেক্ষা যুবতীর সংখ্যাই অধিক ছিল। যুবতী-গণের মধ্যে অনেকেই সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সুন্দরী রমনীর সৌন্দর্য্য-জ্যোতিতে অন্য সকলের সৌন্দর্য্য নিষ্প্রভ দেখাইতেছিল। ভোজন করিতে করিতে আমার প্রথমদৃষ্ট যুবককে এই সুন্দরী যুবতীর প্রতি মুগ্ধদৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিতে পাইলাম। যুবক যেরূপ মুগ্ধদৃষ্টিতে যুবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে-ছিলেন, তাহাতে বোধ হইতেছিল যে, যুবক যুবতীর সৌন্দর্য্যে সম্পূর্ণ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমি ভাবিলাম, এই যুবক এবং যুবতী লর্ড ডাণ্টনীর বোধ হয় সম্পর্কীয় হইবেন।

ভোজন শেষ করিয়া সকলে বৈটক-খানা গৃহে একত্র গমন করিতে উদ্যত হইলে পূর্ব্বোক্ত যুবক আমার নিকটস্থ হইয়া কহিলেন—আসুন মিস্ রেমণ্ড! আপনাকে আমার ভগিনী আনিসিডের সহিত পরিচয় করিয়া দিবার অনুমতি করুন।

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া বুঝিলাম, এই যুবকই স্বয়ং লর্ড ডাণ্টলী। এই যুবককেও আমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার ভগিনীর সহিত পরিচয় করিয়া দিবার প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া, লর্ড ডাণ্টলীর মাতৃস্বসা—যিনি সমস্ত ভোজনসময়ে আমার প্রতি বিগত রাত্রির ন্যায় তীব্র দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন,—এই সময়ে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—

রজার! আমি স্বয়ং মিস্ রেমণ্ডকে অ্যানিসিডের নিকট লইয়া যাইতেছি। তোমার আর কষ্ট স্বীকার করিবার আবশ্যক নাই।

লর্ড ডাণ্টলী ইহাতে মৃদু হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন,—

আমাকে অ্যানিসিড স্বয়ং তাহার শিক্ষয়িত্রীকে তাহার নিকট লইয়া যাইতে বলিয়াছে।

লর্ড ডাণ্টলী এই কথা বলিয়া আমাকে তাঁহার সহিত যাইবার জন্য পুনরায় আহ্বান করিলেন। আমি তাঁহার সহিত যাইতে উদ্যত হইয়া পুনরায় একবার ভোজনাগারের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র পূর্ব্বোক্ত সুন্দরী রমণীকে আমার প্রতি বিস্ময় ও ঈর্ষাপূর্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে দেখিতে পাইলাম। প্রথম সাক্ষাতেই লর্ড ডাণ্টলীর মাতৃস্বসা এবং এই সুন্দরী রমণীর বিস্ময় ও অসন্তোষের পাত্র কেন হইলাম, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

লজ্জাবতী বসু।

স্ত্রীলোক ছাত্রী।

তিন চারি বৎসর মনোযোগ দিয়া স্কুলে পড়িবার পর বিবাহ হইবামাত্র লেখাপড়ার সঙ্গে বালিকার সকল সম্পর্ক চুকিয়াছে—এরূপ অবস্থার স্ত্রীলোকদিগকে দেখিলে আমার যারপর নাই দুঃখ হয়। বছর চারেক মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে বিদ্যার প্রকৃত স্বাদ পাইবার পূর্ব্বেই আবার তাহাদিগকে ছাড়াইয়া আনা হয়, ইহা অতি শোচনীয় কার্য্য। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দুপিতামাতাদিগের উহা ব্যতীত আর উপায় নাই। তবে বিদ্যালয় ছাড়িলেই যে বালিকাকে লেখা পড়া ত্যাগ করিতে হইবে, এরূপ রীতি ত হিন্দু-সমাজে নাই। আর বাড়ীতে ছোট মেয়ে-বোনদের শিক্ষা করিতে দেখিলে চটিয়া যান, এ রকম বাপ ভাই অতি অল্পই আছেন। সেই জন্য বিবাহের পর যত দিন না বালিকা জননীর কর্ত্তব্যে নিযুক্ত হয়, তত দিন অনায়াসে স্কুলের পাঠ্য পুস্তকগুলির আলোচনা করিতে পারে। উহাতে তাহাদের শিক্ষার অভ্যাস থাকিয়া যায়, আর বিদ্যাটুকুও নিরেট হয়। নতুবা

ছোট ছোট ১০।১২ বৎসরের অপরিণত-বয়স্কা বালিকারা স্কুল ছাড়িয়া আসিয়া ঘরে বসিয়া যত জঘন্য নবেল ও অশ্লীল উপন্যাস পড়াতে তাহাদের যে কতদূর অপকার হয়, তাহা বলা যায় না।

অল্পশিক্ষা প্রযুক্ত ঐরূপ অলসভাবে উপন্যাস পড়িয়া সময় কাটানতেই আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গনারীদের অকর্ম্মণ্যতা ও অবশতার প্রধান মূল নিহিত থাকে। বালিকারা স্কুলে খানকতক বই পড়িয়া বাড়ীতে আসিয়া গল্পের বহিতে মুখ খুবড়ে পড়ে থাকে ও ঐ সামান্য শিক্ষা দ্বারা আপনাদিগকে মস্ত বিদ্যাবতী ভাবিয়া ধরাকে শরা জ্ঞান করে।

কার্পেটবোনায় অতিরিক্ত আসক্তি যেমন গৃহকর্ম্মে বাধা দিয়া স্ত্রীলোকদের শারীরিক ও গার্হস্থ্য অপকার করে, শুধু অকেজো গল্পের বই পড়ায় তেমনি মানসিক পীড়া জন্মে। সর্ব্বত্র দেখিয়া ইহাই নিশ্চয় বোধ হয় যে, মানুষের জীবনে যদি উত্তম-রূপে শিক্ষা না ঘটে, তাহা হইলে এক-বারে মূর্খ থাকা হাজার গুণে শ্রেয়। কারণ, উহাতে মন অপ্রশস্ত থাকিলেও অশিক্ষা অল্পশিক্ষিত লোকের মনের ন্যায় মানুষকে ওরূপ স্বার্থপর, হিংসাপ্রিয় ও দম্ভপূর্ণ করিয়া তুলে না।

বিদ্যাশিক্ষার পথেও অন্যান্য কাজের মত প্রথম কয়েক সিঁড়ি অধিক ক্লেশকর। কিন্তু অনেক পরিশ্রম করিয়া একবার বিদ্যা-চর্চ্চায় অভ্যস্ত হইলে কিছুদিন পরে জ্ঞানের সুমধুর ফল ভোগ করিতে পারা যায়।

আর ঐ জ্ঞানের সুখভোগের সঙ্গেই মানুষের মনে কাজের ইচ্ছা বাড়ে। সে কারণে প্রথম কয়েক বৎসরের ক্লেশ ভুগিয়া পরে ঠিক জ্ঞানের স্বাদ পাইবার সময় শিক্ষাভ্যাস ছাড়িয়া দেওয়া কি নির্ব্বোধের কাজ ও দুঃখের বিষয়! কিন্তু ততোধিক দুঃখের বিষয় যে, আমাদের হিন্দুগৃহে প্রায় সকল বালিকাই ঐরূপ নির্ব্বোধের ন্যায় আচরণ করিতে বাধ্য হয়। আমি বলিতেছি না যে, স্কুল ছাড়িয়া প্রত্যেক বালিকাকে স্কুলের শিক্ষাধারামতে ৬।৭ ঘণ্টা বইমুখে থাকিতেই হইবে। ঐ সময় ওরূপ করা মেয়েদের পক্ষে একপ্রকার অসাধ্য; কেননা, বিদ্যাশিক্ষা ছাড়া অন্যান্য অনেক কাজে তখন তাহাদের মন দেওয়া আব-শ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া কন্যাদের যে লেখা পড়া সব একবারে ত্যাগ করিতে হইবে, তার কোনও অর্থ নাই। প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক-গুলি মনোযোগ দিয়া পড়িলেই বালিকাদের সেই পূর্ব্ব-শিক্ষিত বিদ্যাটুকু পাকা হইবে, আর উহার সঙ্গে তাহাদের মনেরও কর্ষণ করা হইবে। কোনও কোনও বালিকা স্বভাবতঃ পাঠপ্রিয়; আর যাহারা উহাতে প্রথমে বিরাগী থাকে, তাহারাও অভ্যাসের দ্বারা উহাতে অনুরাগী হয়। পুস্তকপাঠের অভ্যাস এ সংসারে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ। এ জগতের দুঃখ, অসুখ ও ভগ্নাশার মধ্যে আমরা যদি ভাল বই পড়িয়া মনকে সান্ত্বনা দিতে পারি, তাহা

হইলে ঘোর আঁধার জীবনেও আলো দেখিতে পাই। কোনও বিখ্যাত লেখক বলিয়াছেন যে, একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির লেখনী হইতে যে সব মহাগ্রন্থ বাহির হয়, তাহা সত্য, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের ভাণ্ডারস্বরূপ। উহাতে যিনি প্রবেশ করেন, তিনিই সত্য, প্রেম ও পবিত্রতায় পূর্ণ হইয়া অধিকতর উজ্জ্বল ভাবে বাহিরে আসেন।

তাহা ব্যতীত, পুস্তকের সঙ্গ অনেক সময়ে মানুষের আলাপের অপেক্ষাও বেশী সুখকর ও জ্ঞানপ্রদ। বিশেষতঃ আমাদের সীমাবদ্ধ জীবনে যখন সকল প্রকার জ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপের সুবিধা নাই, বন্ধুবান্ধবের সহিত ইচ্ছামত সাক্ষাৎ করিবার ক্ষমতা নাই, বিদ্যাবান্ লোকদের সহিত মিশিবার রীতি নাই, তখন কেবল ভাল পুস্তকই আমাদিগকে মানবজীবনের ঐ সকল উচ্চ সুখ ও আনন্দ দিতে পারে। একখানি জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থের সহিত তুমি যখন ইচ্ছা দেখা করিতে পার, ইচ্ছানুরূপ আলাপ করিতে পার ও উহা হইতে কত জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পার। উত্তম পুস্তক-সকল সব দেশে ও সব কালেই সুবিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের দ্বারা লিখিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্যের দরজা আমাদের সম্মুখে সর্ব্বদা খোলা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া বাঙ্গলা সাহিত্যেও এখন অনেক উত্তম, চিন্তাপূর্ণ, উচ্চভাবময়, স্বাস্থ্যকর পুস্তক আছে। এই সকল অগণ্য মিত্রকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন কর, দেখিবে তোমাদের বিষাদময় জীবন কত প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে, সংসারের কাজ কত হাল্কা বোধ হইবে, ছেলের গোলমাল আরও কত মিষ্ট লাগিবে।

এক দিনের জন্যও এই অস্থায়ী জীবনের নশ্বরতা ভুলিও না, সর্ব্বদা মনে রাখিও যে, তুমি আজ যাহা পড়িবে, কাল তাহা কখনও পড়িতে পারিবে না। —আজ যে জ্ঞান লাভ করিবে, কাল তাহা কখনও পাইবে না। সুতরাং তোমার চারিদিকস্থ এই সকল বিজ্ঞ লোকদিগের সঙ্গ ছাড়িয়া তুমি কি প্রতিবাসীর সহিত মিছে অসার গল্পে বা আত্মীয়দের কাছে পরনিন্দায় সময় কাটাইবে? ভাল পুস্তক পাঠে ও জ্ঞানশিক্ষায় যত নীচ হিংসা দ্বেষাদি কুপ্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইবে এবং আমাদের অন্তর্জীবন অধিকতর মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ হইবে, হৃদয় অধিকতর পবিত্র হইবে, প্রাণ অধিকতর সুখময় হইবে। আমার বোধ হয়, বাল্যকালে পড়ার অভ্যাস না করিলে বড় হইয়া উহাতে মন দেওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। সেই জন্য মায়েরা যেন বালিকাদিগকে পড়ায় সাধ্যমত উৎসাহ দিতে বিমুখ না হয়েন। অনেক পিতামাতা কন্যাদিগের গল্পের বই পড়িতে আপত্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু সকল উপন্যাসই মন্দ নহে। আর আজকাল বালিকাদের পাঠযোগ্য অনেক নীতিপূর্ণ নবন্যাস বাহির হইয়াছে, সুতরাং পিতামাতারা ইচ্ছা করিলে মেয়েদের জন্য বাছিয়া স্বচ্ছন্দে কত সারগর্ভ পুস্তক কিনিতে পারেন। কিন্তু অন্য দিকে,

বালিকাদিগকে গল্পের বই পড়িতে বারণ করিলে তাহাদিগের পাঠের অভিলাষটুকুও দমিয়া রাখা হয়। কেননা, অল্পবয়স্কা নারীরা যে প্রথমেই সরল গল্পের বই ছাড়িয়া একেবারে বড় বড় গ্রন্থ ধরিবে, এমন আশা আমরা কখনই করিতে পারি না। গভীরচিন্তাপূর্ণ পুস্তক অনেক অধিক শিক্ষাদায়ক হইলেও বিদ্যা ও জ্ঞান একটু না পরিপক্ক হইলে সে সব বোঝা অসাধ্য। উপন্যাস লইয়া একবার পাঠের অভ্যাস করিলে বয়সকালে গল্পের পরিবর্ত্তে জ্ঞানের তৃষ্ণাই বেশী প্রবল হইবে, সুতরাং আপেক্ষিক প্রশস্ত মনে ঐ সকল গভীর ভাব বসিলে উহার উপযুক্ত সুফলও ফলিবে। অতি মিষ্ট সন্দেশে শিশুর যারপর নাই স্পৃহা থাকে, কিন্তু বালক যুবকে পরিণত হইলে শুধু মিষ্টান্নের উপর তাহার লোভ কমিয়া আসে, তখন সে বয়সের উপযুক্ত বেশী ভারী খাদ্য চায়। সেইরূপ প্রাপ্তবয়স্কার প্রশস্ত মন আপনা হইতেই সরল গল্পের বই ছাড়িয়া অধিকতর বড় বড় গ্রন্থের প্রতি ধাবিত হইবে।

অবশ্য বালিকারা যাহাতে কোনও অশ্লীল গল্পের বই বা অপকারী পুস্তক না পড়ে, সে বিষয়ে পিতামাতার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কেবল নীতিধর্ম্মপূর্ণ উপন্যাসই বালিকার পাঠ্য, এ কথা যেন কেহ এক মুহূর্ত্তের জন্য না ভুলেন। আর গল্পের বই সচরাচর দুঃখজনক না হইয়া প্রফুল্লকর হইলেই ভাল হয়। কেননা, গদির উপর বসিয়া উপন্যাসের নায়িকার দুঃখে চক্ষুর জল ফেলায় আমার মতে উপকারের পরিবর্ত্তে মানবহৃদয়ের অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। আমাদের চারিদিকের লোকের প্রকৃত যন্ত্রণা দেখিয়া মনের কষ্টে সমবেদনার সঙ্গে তাহাদের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করাতেই হৃদ্বৃত্তির চালনা ও কর্ষণ করা হয়। কিন্তু উপন্যাসের কাল্পনিক লোকের কাল্পনিক দুঃখে আমরা দুই ফোঁটা অশ্রুবর্ষণ করিয়াই নিরস্ত হই; কাজেকাজেই উহাতে আমাদের মন প্রকৃত কাজের জন্য নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। তদ্ব্যতীত, মানবজীবনে জ্বালা-যন্ত্রণা যথেষ্ট আছে, তাহার উপর কল্পিত গল্পে দুঃখ দেখিয়া আমরা কেন ব্যথিত হইব?

(ক্রমশঃ)

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মহাজনগণের অভিমত।

১। নারী ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ রচনা—কনফুসো।

২। স্ত্রীলোকেরা বিশ্রাম, ভদ্রতা এবং সম্মান শিক্ষা দেয়—ভল্‌টেয়ার।

৩। সেক্‌সপিয়রের নায়ক নাই, কেবলই নায়িকা—রাস্‌কিন।

৪। আমি যাহা কিছু হইয়াছি, তাহা

আমার মাতাই করিয়াছেন—জন কুইন্সি এডাম।

৫। যদিও স্ত্রীলোক হইতে ইডেন হারাইয়াছিলে, কিন্তু স্ত্রীলোক হইতেই তাহার উদ্ধার হয়—হোয়াইট্ টিব।

৬। স্ত্রীলোক যখন স্ত্রীপ্রকৃতির উপযুক্ত হয়, তখন পূর্ণতা লাভ করে—গ্লাডষ্টোন।

৭। সুন্দরী স্ত্রীলোক রত্ন, সাধ্বী স্ত্রীলোক অমূল্য ধন—সানিডি।

৮। সমুদয় মহৎ কার্য্যের মূলে রমণী—ডামাটিন।

৯। স্ত্রীর অম্লানবদনে অভ্যর্থনা জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুমধুর সুর—এন্, পি, উইলিস্।

১০। স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ যখন দয়ার আধার হয়, তখন তদপেক্ষা স্বর্গীয় দৃশ্য আর কিছুই নাই—লাদার।

নূতন সংবাদ।

১। শোকসংবাদ—দুর্ব্বহ শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে আজি আর একটী ঘোরতর শোকসংবাদ প্রচার করিতেছি। অতুলপ্রতিভাশালী, বিদ্বান্, সুলেখক, সমালোচকাগ্রণী, হৃদয়বান্, মধুরপ্রকৃতি চন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, বি, এল্, আজি বঙ্গভূমিকে কাঁদাইয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন! তিনি দীর্ঘকাল বহুমূত্ররোগে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। বারংবার সাংঘাতিক স্ফোটকে গতাসুপ্রায় হইয়াছিলেন। তদুপরি একটী পুত্রের ও একমাত্র কন্যার মৃত্যুশোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যাটীর শোকশেল্য তাঁহার অন্তঃস্থল ভেদ করিয়াছিল। তথাপি তিনি মাতৃভাষার সেবায় বিরত হন নাই। তিনি পূর্ব্বে ইংরাজি ভাষায় সুলেখক বলিয়া খ্যাত হন। অনন্তর ভগবৎকৃপায় ও স্বদেশের সৌভাগ্য বশতঃ মাতৃভাষায় লেখনী ধারণ করেন। মাতৃভাষায় "শকুন্তলাতত্ত্ব" তাঁহার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। উহা তাঁহার প্রতিভা ও সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী শক্তির চরম পরিচয়। অনন্তর তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সিকলেজের খ্যাতনামা শ্রেষ্ঠ ছাত্র। বি এ, এম, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ডেপুটি-মাজিষ্ট্রেট, পরে জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ, অনন্তর, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের লাইব্রেরিয়ান্ ও তাহার পর বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক (Translator) ইত্যাদি উচ্চপদ যথাক্রমে অতীব সুখ্যাতির সহিত নির্ব্বাহ করিয়া, শেষে পেন্সন লইয়া মাতৃভাষার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। দুর্ভাগা বঙ্গভূমি একে একে সমস্ত সার সার রত্নগুলি হারাইলেন! অহো! দেশের কি দুর্ভাগ্য! দয়াময় ঈশ্বর চন্দ্রনাথের শোকার্ত্ত পরিবারে সর্ব্বসন্তাপহারী শান্তিবারি বর্ষণ করুন।

২। হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁহার রাজ্যে কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যে কুষ্ঠ-রোগীর সংখ্যা অধিক।

৩। পঞ্জাবে সিন্ধুনদের জলপ্রবাহ এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, অনেক স্থান প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। কোট বন্দর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। সহরে জল প্রবেশ নিবারণার্থ বাঁধ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বাঁধ সকল স্রোতে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

৪। লর্ড মর্লি অনারেবল মিঃ কে, জি, গুপ্তকে জানাইয়াছেন যে, ভারতবাসিগণ যেরূপভাবে সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ডের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সম্রাট্ ৫ম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী সন্তোষ লাভ করিয়াছেন।

৫। আমেরিকার কৃষিবিজ্ঞানবেত্তা ব্যক্তিগণ বিনা সলিলসেচনে শস্য-উৎপাদনপ্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট শুষ্ক ভূমিতে শস্য উৎপাদন করিয়াছেন। আমাদের দেশে কৃষি বৃষ্টির উপরেই নির্ভর করে। যে বৎসর বৃষ্টি না হয়, সে বৎসর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই নবাবিষ্কৃত কৃষি-প্রণালী আমাদের দেশে প্রচলিত হইলে এ দেশের কৃষিকার্য্যের অনেক সুবিধা হইবার সম্ভাবনা।

৬। শুনা যাইতেছে, লর্ড মিণ্টোর পর সার্ চার্লস্ হার্ডিঞ্জ ভারতের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হইবেন। তাঁহার বয়স এখন ৫২ বৎসর।

৭। এবার ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ২টী মহিলা বৃত্তি পাইয়াছেন।

২৫৲ টাকা বৃত্তি।

শ্রীমতীপ্রীতিবালা ঘোষাল—বেথুনকলেজ।

২০৲ টাকার বৃত্তি।

শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা রায়—বেথুনকলেজ।

৮। কলিকাতার শিক্ষিত মুসলমানগণ অনাথ-আশ্রমে ৬৯ জন নিরাশ্রয় মুসলমান বালকের ভরণপোষণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। ইঁহারা এইরূপ অনাথ পালন করিয়া সম্রাট্ ৭ম এডওয়ার্ডের স্মৃতিরক্ষা করিবার জন্য অভিলাষী হইয়াছেন।

সমালোচনা।

আমরা মাজু লাইব্রেরীর আড়াই বৎসরের একখানি কার্য্য-বিবরণী পাইয়াছি। লাইব্রেরী অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, তজ্জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ ধন্যবাদের যোগ্য। আমরা ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।

বামারচনা।

দুঃখিনীর ধন।

তোরা কিগো দেবশিশু দুঃখিনীর ধন!
তোরা এ তাপিত বক্ষে পবিত্র জীবন?
আমি কাঙালিনী নিঃস্ব,
তোরা মোর সরবস্ব,
সংসার-মরুভূ-মাঝে নন্দনকানন।
অভাগী দেবের বরে,
লভিয়াছে তো' সবারে
তোরা মোর দগ্ধ হৃদে শান্তি-প্রস্রবণ।
সংসারের দাবানলে,
যখন পরাণ জ্বলে
ভুলে যাই সব দুঃখ হেরি ও বদন।
ভুলে যাই সব কথা,
ভুলে যাই মর্ম্ম ব্যথা
না জানি কি সুধামাখা তোদের আনন!
হেরিলে তোদের মুখ,
কি অমৃতে পোরে বুক,
(সে বুঝিবে, মোর মত অভাগা যে জন)।
তখন ভুলিয়া যাই,
আমার যে কিছু নাই,
আমি যে অভাগা নিঃস্ব থাকে না স্মরণ।
জগতের ধন-রত্ন
কোন্ তুচ্ছ, কেন যত্ন?
তোরা যে অভাগিনীর অতুলন ধন।
হতাশের আশা তোরা,
সুষমা-পীযূষ-পোরা
বিধাতার বর মোর তোরা যাদুধন!
সংসারের উপেক্ষায়,
কি ভয় কি ভয় তায়?
তোরা মোর সংসারের আশার স্বপন!
তোমাদের লয়ে বুকে,
সহিব সকল দুখে,
তোরা মোর পারিজাত নন্দনকানন।
তোরা সে দেবের স্মৃতি,
তোরা মোর সুখ-প্রীতি,
তোরা মোর আশাতরু শান্তি-নিকেতন।
(আয় সদা বুকে রাখি ওরে যাদু ধন!)

তোমাদের দুঃখিনী মা
শ্রীচারুশীলা মিত্র।

যতটুকু পার তুমি কর কার্য্য আপনার।

যত টুকু পার তুমি কর কার্য্য আপনার,
সকলেই আজ্ঞাবহ সেই বিশ্ববিধাতার,
ক্ষুদ্র তারা আলো করে, অগণ্য বৃক্ষের পাতা,
অটবীরে ছায়া দিতে সৃষ্টি করেছেন ধাতা।
যে টুকু করিতে পার এই বেলা লও করে,
প্রাণবায়ু যতক্ষণ পলায়ন নাহি করে,
মরণের স্বেদবিন্দু ললাটে দেখা না দিতে,
শীতল সে স্বেদবিন্দু স্মরণ রাখিও চিতে।

যতটুকু কার্য্য তুমি করিয়াছ এ জগতে।
যে জীবন-সংগ্রামেতে জয়ী তুমি এ মরতে,
ক্ষুদ্র! ক্ষুদ্র কথাগুলি স্নেহ মমতায় ভরা,
ক্ষুদ্র দোষ করি তাহা তখনি স্বীকার করা,
পরের অভাবগুলি সযতনে দূর করা।
এইরূপ যত গুণ একত্র হইবে তারা।
অন্তিমে মস্তক তব অলঙ্কৃত করি দিবে,
পবিত্র আলোক আনি দেহে তব ছড়াইবে,
কিছুই না যায় সঙ্গে শুধু এই ধনগুলি—
যাইবে তোমার সনে দূর অমরায় চলি।
"যা কিছু করেছ তুমি সকলি আমার তরে"
যীশুর এ কথাগুলি তোমার শ্রবণদ্বারে—
পশিবে, অনন্ত কাল এ গুলি ধ্বনিত হবে,
অমরায় গিয়া তুমি এই পুরস্কার পাবে।

ভুলিও না মোরে কভু।

ভুলিও না মোরে কভু, স্মরণ রাখিও প্রভু!
কর মোরে কার্য্যে নিয়োজন,
তুমি নাহি চাও যারে, থাকে পড়ি একধারে,
ভগ্নপাত্র প্রায় সেই জন।
যত বস্তু এ সংসারে, সবে নিজ কার্য্য করে,
সবে করে তোমাতে নির্ভর;
তব সৃষ্ট বস্তুচয়, তব কার্য্যে রত রয়,
হউক যতই ক্ষুদ্রতর।
গিরিশৃঙ্গ সুবিপুল, অত্যুচ্চ নক্ষত্রকুল,
ক্ষুদ্র গিরি ক্ষুদ্র হিমকণা;
সবে তব কার্য্য করে, দয়াময়! যেন মোরে
কার্য্যে নিয়োজিতে ভুলিও না।
বসিয়া প্রাচীরোপরে, ক্ষুদ্র পাখী গান করে,
মহাকায় বিহঙ্গ ঈগল;
ছোট বড় নদ নদী, বিটপী কুসুম আদি,
তব কার্য্যে নিযুক্ত সকল।
আল্প গিরিশৃঙ্গ-মাঝে, দেবদারু তরু রাজে,
লিলি শোভে উপত্যকাপরে;
ক্ষুদ্র গুপ্ত সরোবর, কিম্বা বিস্তীর্ণ সাগর,
সকলে তোমারি কার্য্য করে।
উপত্যকা-ভূমি-মাঝে, বিপুল গিরি বিরাজে,
সিন্ধুনীরে ক্ষুদ্র বালুকণ,
ভ্রাম্যমাণা-কাদম্বিনী-কৃত ঘোর বজ্রধ্বনি,
মক্ষিকার মৃদুল গুঞ্জন।
যত বস্তু এই ভবে, তব কার্য্যে রত সবে,
ছোট বড় আছে প্রাণী যত,
ওহে জগতের স্বামী! অতি ক্ষুদ্রতম আমি,
আমারেও কর কার্য্যে রত।

কেমনে চাহিব।

যেন জন ডাকিতে জানে সেই পায় নাথ!
তোমার চরণ।
অর্পিতে শিখাও যারে, সেই করে ওই পদে
সর্ব্বস্ব অর্পণ।
আমি ত তোমারে প্রভু! ডাকিতে
শিখিনি কভু,
জানি না কি বলে ডাকি পাইব তোমায়,
কেমনে এ দগ্ধপ্রাণ দিব তব পায়!

তোমার অমৃত নাম মোহে ভুলে হায়!
লইনি কখন,
ছিছি আপনারে ল'য়ে কি তুচ্ছ খেলায়
ছিলাম মগন!
আজি জীবনের মাঝে, এ মহা প্রলয়মাঝে
কি বলিয়া দয়াময়! লব তব নাম,
কেমনে চা'(হি)ব ও পদ চিরশান্তিময়।

আমার হৃদয়।

আমার হৃদয় ছিল
ফুটন্ত ফুলের মত,
সৌন্দর্য্যের একশেষ
সুধাভারে অবনত। ১
চাঁদিমার স্নিগ্ধ আলো
পরাণে খেলিত মোর,
বাসন্ত মলয় মোরে
কি ভাবে করিত ভোর। ২
বাপীতীরে বসি আমি
আঁকিতাম সুখ ছবি।
উছলিত হিয়ামাঝে
হৃদয়ের সুখ-রবি। ৩
ছিল নাগো কুটীলতা
সুখময়ী ধরাখান।
শুনিতাম আনমনে
বিহগের মৃদু গান। ৪
পিতার আদর আহা,
মায়ের স্নেহের বাণী,
বিভোর করিত মোরে
নাচিত পরাণখানি। ৫
বিষাদ ভাবনা কিছু
ছিলনা পরাণে মোর।
খেলিতাম কত খেলা
কি ভাবে হইয়ে ভোর। ৬
কভু জ্যোৎস্নায় বসি
ক'টি ভাইবোন মিলি,
হাস্যমুখে ডাকিতাম
আয় চাঁদ আয় বলি। ৭

এবে

জ্যোৎস্না গিয়াছে চলে
এসেছে আঁধার ঘোর,
কোথা সে চপল হাসি,
কোথা সে হৃদয় মোর। ৮
আমার খেলার সাথী
কোথায় গিয়েছে চলে,
একা আমি বসে আছি
বিস্মৃতির তরুমূলে ॥৯॥

শ্রীপ্রিয়বালা রায়,
নিলফামারী।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।